প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৬৩

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল

প্রচ্ছদপট
শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস

মুদ্রক
শ্রীকিঙ্করকুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৬।

সূচী

নিবেদন

কথাটি হল—'উচ্চারণ।'

রামকৃষ্ণের উচ্চারণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

বিবেকানন্দ বলেছেন, "কবিত্বের মধ্য দিয়ে উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য বিধাতা যেন উপনিষদের ঋষিগণকে সাধারণ মানবের বহু ঊর্ধ্বে'র কবিরূপে সৃষ্টি করেছেন।"

রামকৃষ্ণ ঋষি-কবি। রামকৃষ্ণ-কথা নিঃসন্দেহে বাংলায় নব-উপনিষদ।

বাংলা সাহিত্যের অকল্পনীয় এক সৌভাগ্য—সর্বোচ্চ অধ্যাত্মপুরুষেব মুখের কথাকে তা সরাসরি ধারণ করতে পেরেছে। দেখা গেল, বাংলা চলিত ভাষার অপরিসীম শক্তিকে—তা গূঢ় ও গভীরতম বিষয়কে প্রকাশ করতে পারল, যেন অক্লেশে! সবিস্ময়ে ভাবতে হয়—সে কোন্ অনন্য প্রতিভা যা চলিত বাংলার মধ্যে ঐ শক্তি সঞ্চার করতে সমর্থ হল! এ-জিনিস বাংলায় কিছু পরিমাণে ঘটতে দেখা গেছে দুই সিদ্ধকবির রচনায়—চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ। এবং আভাস আছে সহজিয়া ও বাউলদেব গানে। পূর্ণতা ঘটল রামকৃষ্ণে।

এইখানেই আক্ষেপ ও বেদনা এসে জমে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁবা লোকহিতায় এসেছেন—তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।" হায়, সরাসরি পেলাম না বুদ্ধের মুখের ভাষা, কিংবা শ্রীচৈতন্যের। রামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রথম খণ্ড পেয়ে অধ্যাপক-লেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছিলেন, "পৃথিবীর ঐশ্বর্যভাণ্ডার আরও কত অপূর্ব রত্নরাজিতে না পূর্ণ হয়ে উঠত যদি রামকৃষ্ণের উক্তিসংগ্রহের মতো ক'রে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্যের সকল উক্তি সংগ্রহ করা যেত!"

তবে পেয়েছি রামকৃষ্ণকে। সেই 'অশিক্ষিত' রামকৃষ্ণ—যাঁর উক্তির বিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষিতেরা অক্লান্ত উদ্দীপনায় প্রশস্তি করেছেন—তাঁরা অধিকাংশই মূল বাংলায় নয়, রামকৃষ্ণ-বাণী পড়েছেন অনুবাদে, অথবা অনুবাদের অনুবাদে।—

"অপূর্ব কাব্যিক ভাষায় সুগভীর প্রজ্ঞার সেই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ।
হীরা মুক্তা ও নীলমণিতে পূর্ণ মন তাঁর,
ক্যালাইডোস্কোপের তুল্য যথেচ্ছ নাড়িয়ে ওলট-পালট করা হয়,
কিন্তু সর্বদাই তা মূল্যবান চিন্তারাজিকে অঙ্কিত ক'রে যায়—
মনোহর রূপরেখায়।" (ফ্রেডারিখ্ ম্যাক্সমূলার)

"তাঁর মুখ থেকে অব্যস্ত কিন্তু অবিরাম গতিতে বয়ে যেত অপূর্বতম প্রজ্ঞার ধারা।
স্মরণকালের মধ্যে রামকৃষ্ণের মতো ক'রে কথা বলতে পারেন নি কেউ।

পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা প্রায় অপ্রাকৃতিক, সর্বশ্রেণীর মানুষকে জানতেন নিকট থেকে।
তাঁর উপমাদি অলঙ্কার অসামান্য সুন্দর, প্রায়ই সেগুলি মৌলিক।
সত্তা এমনই ঊর্ধ্বাসীন যে, মানুষ তাকিয়ে থেকেছে রুদ্ধশ্বাসে, স্তম্ভিত বিস্ময়ে।
মুখে-মুখে রচিত হয়েছে বেদ, উপনিষদ, এমনকি মহাকাব্যগুলিও,
মানবসমাজের পথপ্রদর্শক সকল মহান আচার্য শিক্ষা দিয়েছেন মুখে মুখে,
বাতাসে পাখা মেলেছে মুখের শব্দ, পরে তাদের ধরা হয়েছে লেখার খাঁচায়।"

(নাগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

"ঈশ্বর-দর্শন, যোগ ও প্রেমের গভীর কথাসকল বলিতে বলিতে,
সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে,
তিনি প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন।
হাসিতেন, কাঁদিতেন ; সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায়, ব্যবহার করিতেন।
সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিতেন।
ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্রে তাঁহার সমাধি হইত।
তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে মধুর হাসি,
বাহ্যচৈতন্যশূন্য সর্বাঙ্গ স্পন্দহীন, মৃত প্রস্তরের ন্যায়।"

(কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায়)

"তাঁর কাছে ধর্ম মানে ভাবোন্মাদনা, উপাসনা মানে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।
বিচিত্র বিশ্বাস ও উপলব্ধির অগ্নিদাহে দিবারাত্র জ্বলন্ত দেহমন।
তাঁর সংলাপ সেই অন্তরাগ্নির অবিরাম শিখাবিস্তার।
মনুষ্যজগৎ ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি থেকে মনে হয়—
বুঝি দিব্যবাণী ও মৌলিক প্রজ্ঞার দিন ফিরে এসেছে আবার।
মন আমার ভাসছে সেই জ্যোতির্ময় জগতে, অপূর্ব মানুষটি যাকে সৃষ্টি করতেন,
মন ভাসছে সেই রহস্যময় অনির্ণেয় সকরুণ বেদনাপ্রবাহে—
যা উৎসারিত হত তাঁর ভিতর থেকে নিরন্তর।" (প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)

"গ্রাম্য কৃষিজীবী মানুষদের মধ্য থেকে আগত প্রায়-নিরক্ষর এই মানুষটি—
মৌলিক চিন্তা ও ব্যাপক অনুশীলনের ক্ষেত্রে মহাপ্রাজ্ঞ।
তাঁর সংস্পর্শে উপনীত মানুষ অনুভব করত—
এমন শক্তির সম্মুখীন হয়েছে তারা—যার কূলকিনারা নেই,
তাঁর জ্ঞানরাশির গভীর উৎসে প্রবেশের সাধ্য নেই কারো।
কথা বলতে-বলতে কিসের এক টানে চলে যেতেন গভীর রাজ্যে,
কোনো এক আনন্দময় লোকে ; মুখে নামত অপূর্ব জ্যোতি।
ধর্মসংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপ সম্বন্ধে মানুষের সর্বোচ্চ কল্পনার পূর্ণসিদ্ধি—রামকৃষ্ণ।
'প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র গৃহদ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে অনন্তের রাজপথের দিকে'—
এটি কি একটি সুমহান মত নয়—যা ছিল রামকৃষ্ণের ! (নিবেদিতা)

"উনিশ শতকের ইংরেজি মনীষার সর্বোত্তম ফল প্রকাশিত হয়েছে—
রবার্ট ব্রাউনিং ও জন রাসকিনের রচনায়।
বাংলার বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যহীন রামকৃষ্ণের তুলনায়—সেই তাঁরাও হাতড়েছেন অন্ধকারে।
আমরা যাকে বিদ্যা বলি, তা না-জেনেও রামকৃষ্ণ যেভাবে কথা বলেছেন—
তেমন ক'রে বলতে পারেন নি তাঁর যুগের অন্য কেউ।
ঈশ্বরকে উন্মোচন করেছিলেন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের কাছে।" (উইলিয়ম ডিগবি)

"তিনি জাগিয়েছেন ঘুমন্ত আরণ্য সৌন্দর্যের নির্ঝরগুলিকে,
এনেছেন সমুদ্র-শৈবালের সুমিষ্ট গন্ধ, মহাসাগরের লবণাক্ত স্বাদ।
আলাপ করতেন সক্রেটিসীয় ভঙ্গিতে।
সেগুলি গ্যালিলিবাসী মানুষটি অপেক্ষা ম'তেন ও এরাসমাসের অধিক সহধর্মী।
ভারতের মহাসঙ্গীত—রামকৃষ্ণ।
প্রাচীন প্রতিভাদের সৃষ্টিগুলির মতোই অতীতের বহুবিচিত্র সুরের সমাবেশে তা রচিত।
রামকৃষ্ণ তাঁর সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংহত ক'রে
সকল সুরের দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন ঐশ্বর্যপূর্ণ ঐকতান।" (রোমা রোলাঁ)

"ভারতের ধর্মপ্রজ্ঞা ও বাণীর বিখ্যাত বিরাট বিগ্রহ রামকৃষ্ণ—
মানবসমাজের জন্য উন্মোচন করেছেন যাদুরহস্য, তাঁর উক্তিতে।
প্রাচীন গ্রীসের সমুদ্রদেবতা প্রোটিয়াসের প্রাণসম্পন্ন তিনি,
বাসনাময় আবেগে নবরূপান্তরে পারদর্শী আত্মা তাঁর,
আকাশ-উচ্চ দিব্যতা ও অতলস্পর্শী গহ্বরকে সমভাবে পরিমাপ করতে সমর্থ।"
(হেনরি আর জিমার)

"ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যদেশ অন্যায়ভাবে নিজ সীমায় আবদ্ধ।
তার দর্শন আরম্ভ হয় প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে,
তার রহস্যবাদ আরম্ভ হয় প্লেটো কিংবা প্লটিনাস থেকে,
তার ধর্ম আরম্ভ হয় জিউস, জিহোবা কিংবা যীশু থেকে।
পাশ্চাত্ত্য জগতের ধর্মচিন্তা ও রহস্যবাদের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ নব-আবির্ভাব।
রামকৃষ্ণের কথায় রয়েছে প্রাচীন দৈববাণীর প্রজ্ঞারূপ,
সক্রেটিসের তীক্ষ্ণধার উক্তির বৈশিষ্ট্য, কনফুসিয়াসের ঘরোয়া সহৃদয়তা,
এবং ডাঃ জনসনের ব্যক্তিগত টুকরো কাহিনীর সমাহার।" (আরউইন এডম্যান)

"ঈশ্বরত্বের জীবন্ত বিগ্রহ—রামকৃষ্ণ। তাঁর নয় পণ্ডিতের বচন।
জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠা সেগুলি, নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উদ্‌ঘাটন।
বিশ্বাসের উজ্জ্বল জীবন্ত দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণের প্রেম স্বীকার করেনি
ভৌগোলিক বা অন্য কোনো সীমাকে।" (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)

"শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সর্বাত্মকভাবে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিপুরুষ যে,
অসচেতনভাবে তিনি মহান হিন্দুশাস্ত্রের ভাষ্য হয়ে উঠেছিলেন।
আধুনিককালে তার থেকে শ্রেষ্ঠতর ভাষ্য রচিত হয়নি।
ঐশ্বরিক জীবন যাঁরা যাপন করেন তাঁদের কথায় থাকে অদ্ভুত শক্তি,
তাঁদের বাণীতে ব্যক্ত হয় তাঁদের গোটা জীবন।
দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব, দার্শনিক মতবাদ যত সুন্দরই হোক—
ঈশ্বর-প্রাণিত ব্যক্তির উচ্চারণের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না।" (রাজাগোপালাচারী)

"রামকৃষ্ণকে তাঁর কথামৃতে প্রত্যক্ষ করি অখণ্ড চৈতন্যরূপে।
সে কাহিনী নিত্যকালের, তার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই।
তাতে রয়েছে তাঁর কথা যিনি অবস্থিত নিত্য বর্তমানে।
ঈশ্বরের অস্তিত্বে অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই।
রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের অর্থ হল—চির-বর্তমানে অবস্থান।" (ক্রিস্টোফার ইশারউড)

"রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাত্মারা সত্যের সর্বাত্মক ধারণায় সমর্থ।
পরমতত্ত্বের বিভিন্ন রূপের তাৎপর্য অনুধাবনের শক্তি তাঁদের আছে।
ধর্মরাজ্যে বিশুষ্ক নৈরাজ্যের যুগে পরম উপলব্ধিযোগে
তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।
তা সম্ভব হয়েছে যেহেতু তাঁর বিশাল সত্তা
ধর্মসাধনার আপাতবিরোধী শক্তিগুলিকে সম্মিলিত করতে পেরেছিল;
এবং পণ্ডিত ও ধর্মধ্বজীদের বিদ্যাভিমান ও আড়ম্বরবাহুল্যকে
চিরদিনের জন্য হতমান করেছিল—তাঁর সহজ স্বরূপ।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"পুণ্য ভগবান রামকৃষ্ণ হিমালয়-শিখর থেকে আনছেন ওঁ-কার।
বাতাসে উড়ছে তাঁর গৈরিক বস্ত্র।
শুভ্র তুষারকে স্পর্শ করেছে শ্রীচরণ—কি গরিমায়!
মানবসমাজের কাছে আনন্দ ও অমৃত বিকশিত করতে অগ্রসর তিনি।
ঝঞ্ঝামুখী মেঘগণ মানবজাতির আলোড়িত দুঃখবেদনার দ্যোতক।
কিন্তু পুণ্য ভগবান রামকৃষ্ণের মাথার চতুর্দিকে জ্যোতির্বলয়।
আলোর দিশারী তিনি।
ঘৃণার লজ্জাকে ছাপিয়ে, পরস্পরকে সংহারের হিংসার উপরে জেগেছে
রামকৃষ্ণের আনন্দঘন পুণ্যবাণী, হৃদয়ে-হৃদয়ে।
সে বাণী পবিত্র বনস্পতির মতো—বিস্তার করেছে অগণ্য শাখা।
মানুষের যাত্রাপথে জ্বলেছে কল্যাণের আলো, বেজেছে শুভশঙ্খ।"

(নিকোলাস রোরিখ)

রামকৃষ্ণ-কথার সামগ্রিক পরিচয়ের মধ্যে তাহলে আমরা পেয়ে যাই :
কখনো উপনিষদের গম্ভীর উচ্চারণ, কখনো ধর্মপদের সুনির্দিষ্ট অনুশাসন.
কখনো বাইবেলের ধ্রুব আশ্বাস, কখনো সক্রেটিস-প্লেটোর প্রজ্ঞাগাঢ় সংলাপ,
কখনো কনফুসীয় বস্তুমুখী নৈতিকতা, কখনো ঈশপের নীতিকাহিনী,
কখনো কবীর, নানকের অরূপ-লক্ষ্য ধর্মদেশনা.
কখনো চণ্ডীদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈয়ের আত্মনিবেদন,
আবার কখনো লোককবিদের মৃণ্ময়ভেদী চিন্ময়ের শিহরণ।

রামকৃষ্ণ কথামৃতভুক্ত রামকৃষ্ণের নানা উক্তিকে, সেইসঙ্গে শ্রীম-বর্ণিত রামকৃষ্ণ-রূপকে এই গ্রন্থে সহজ গদ্যছন্দের আকার দিতে চেয়েছি।

না, এই গ্রন্থে উপরে-কথিত রামকৃষ্ণের রূপ পূর্ণমাত্রায় আছে, এমন দাবি করব না। তার জন্য সমগ্র রামকৃষ্ণ-কথার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। তবে চুম্বক আছে এখানে—মহাশৈলে যার জন্ম।

পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, গদ্যকবিতায় রূপ দেবার সময়ে আমি রামকৃষ্ণ-কথাকে অবিকৃত রেখেছি। ছন্দের প্রয়োজনে কেবল মাঝে-মাঝে শব্দসংক্ষেপ বা বস্তুবর্জন করেছি, কিংবা পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে অল্পস্বল্প পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সামান্য চেষ্টাতেই রামকৃষ্ণের মুখের কথা—কাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে রামকৃষ্ণের উক্তির অন্তর্লীন কাব্যময়তা প্রতীয়মান হয়। পাঠকগণের সুবিধার জন্য উৎসনির্দেশ করেছি, প্রতিটি 'কবিতা'র পরে আনন্দ পাবলিশার্স-প্রকাশিত কথামৃতের পৃষ্ঠাসংখ্যা জানিয়ে। 'কবিতা'গুলির নামকরণ আমি করেছি।

পাণ্ডুলিপি অল্পবিস্তর পড়ে যাঁরা মন্তব্য ক'রে উপকার করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রীবিমলকুমার ঘোষ, শ্রীঅরুণ ঘোষ, শ্রীসুদীপ বসু এবং শ্রীমতী মায়া বসু। বইটির বিষয়ে স্বামী সোমেশ্বরানন্দের আগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গ্রন্থ প্রস্তুতকালে একটি আবিষ্কারে উল্লসিত হয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঠকদের কাছে সে-ব্যাপারটি নিশ্চয় সর্বদাই গোচর ছিল—দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার কাছে নয়। যেন সহসা আবিষ্কার করেছিলাম—শ্রীম কেবল রামকৃষ্ণ-কথার লিপিকর নন, তিনি রামকৃষ্ণ-জীবনের মহাকবিও। কথামৃত পড়ার সময়ে রামকৃষ্ণ-কথার দীপ্তি এবং গভীরতা এমনই মোহিত রাখত যে, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীম'র নিবেদিত বর্ণনাগুলি যেন চোখেই পড়েনি। খুবই স্বাভাবিক, অন্তত আমার কাছে, কেননা রামকৃষ্ণ যখন কথা বলেন, তখন একমাত্র তিনিই থাকেন। কিন্তু তাঁর বাক্-প্রতিমার রূপ-সম্মোহন কাটিয়ে (যা অবশ্য অসম্ভব) যখন প্রতিমার পশ্চাতের চালচিত্র, বা পাদদেশের আলিম্পনে নজর দিতে চেয়েছি (বই লিখতে গেলে তা করার দরকার হয়ই) তখন দেখলাম—এক পরমাশ্চর্য অপেক্ষমাণ আমার জন্য—মহাকবি ও শিল্পী শ্রীম। রামকৃষ্ণের কী-সব অপরূপ বর্ণনাই না তিনি করেছেন! কখনো তাতে ক্লাসিক গাম্ভীর্য,

কখনো মিস্টিক রহস্যময়তা, কখনো-বা চিত্রশিল্পীর মৃদুস্পর্শ তুলিকার কোমল লাবণ্য। নানারূপে রামকৃষ্ণকে শ্রীম দেখেছেন—নানা মন ও পরিবেশে। এবং তাঁর কণ্ঠে দুলেছে যেন শব্দের সুদীর্ঘ আরতি। "শ্রীম'র নয়নে ও মনে" পর্বটির দিকে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি "শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মদর্শন" এবং "সাধনার জ্বলন্ত অরণ্যে" পর্বের দিকেও। ভারতবর্ষ একদা বস্তুবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল—কিন্তু তার আধিপত্যের মহারাজ্য অন্তর্বিজ্ঞানেই। "ঈশ্বর-নামক মহাগ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয়নি"—বিবেকানন্দের এই উক্তি অবশ্য-স্বীকার্য। আর একথাও স্বীকার্য—উক্ত মহাগ্রন্থের অধিকসংখ্যক পৃষ্ঠায়-ভারতবর্ষীয়দের রচনাই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে একালে রামকৃষ্ণই সর্বোত্তম লেখক। "আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসমূহের বিবরণ" লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত—দার্শনিক, গবেষক ও মনোবৈজ্ঞানিকেরা। বিশেষ-বিশেষ পথবাহী যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকাহিনী তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই সেসব পরোক্ষ সংবাদ। রামকৃষ্ণের মতো "অধ্যাত্মরাজ্যের দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট"-এর স্বমুখ-বর্ণিত অভিযানকাহিনী পূর্বে পাওয়া যায়নি। এই গ্রন্থের উল্লিখিত পর্বগুলিতে তেমনই কিছু আশ্চর্য সংবাদ রয়েছে।

গ্রন্থ প্রকাশকালে দুটি বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের (বরাহনগর মঠ) শতবার্ষিকী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সার্ধ শতবার্ষিকী এই বৎসরই পড়েছে। রামকৃষ্ণকে কালের অক্ষরে প্রকাশ করা অবশ্যই সম্ভব নয়; তাঁর সার্ধ শতবার্ষিকী পালনের মধ্যে আমাদের মতো মানুষের ভক্তির উত্তেজনা আছেই। রামকৃষ্ণ মঠেরও ললাটে বহু শতাব্দী-দীর্ঘ আয়ুর লিপি। তাই তার শতবার্ষিকী বিস্ময়কর ঘটনা নয়। তবু, শেষপর্যন্ত সব আয়োজন আমাদেরই জন্য। পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছু সময়ের জন্য আমরা দেখে নিই পশ্চাতের পৃথিবী—সম্মুখের জগতে প্রবেশের প্রয়োজনে। অন্তত একশো বছর আগেকার, ১৮৮৬, ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রির মাহেন্দ্রক্ষণটিকে, স্মরণ করবই, যখন হুগলি জেলার এক গণ্ডগ্রামে ধুনির আগুন জ্বলেছিল, কয়েকটি তরুণ আগুনের শিখার মতো লক্‌লক্‌ ক'রে উঠেছিল একটি প্রতিজ্ঞায়—আমরা অনিত্য সংসার ত্যাগ করব নিত্য সংসারের সন্ধানে।

সে অগ্নির অপর নাম—রামকৃষ্ণ।

১ বি, ওলাবিবিতলা লেন,
হাওড়া—৩
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৮৬

শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মদর্শন

আমার পিতা

আমার বাবা খড়ম পায়ে যখন রাস্তায় চলতেন,
গাঁয়ের দোকানীরা উঠে দাঁড়াত—
'ঐ তিনি আসছেন।'
যখন স্নান করতেন হালদার পুকুরে--
লোকেরা নাইতে যেতনা সাহস ক'রে।
খপর নিত—উনি কি স্নান ক'রে গেছেন ?
বলতেন--'রঘুবীর, রঘুবীর !
বলতে-বলতে বুক রক্তবর্ণ। (৬৮৬)

বাবা গিছলেন গয়াতে,
সেখানে স্বপ্ন দিলেন রঘুবীর—আমি ছেলে হব তোমার।
বাবা বললেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
কেমন ক'রে সেবা করব তোমার ?
রঘুবীর বললেন, তা হয়ে যাবে। (৬৫৬)

বাল্যেই আবির্ভাব

ছেলেবেলায় আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর।
এগারো বছর বয়সে মাঠের উপর কী-যে দেখলুম !
সবাই বললে, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলুম,
সাড় ছিল না একেবারে।
সেইদিন থেকে হয়ে গেলুম আর একরকম,
নিজের ভিতরে দেখতে লাগলুম আর একজনকে।
ঠাকুরঘরে পুজো করতে যেতুম—
হাতটা ঠাকুরের দিকে না গিয়ে চলে আসত নিজের মাথার উপরে।

ফুল দিতুম নিজেরি মাথায়।
যে-ছোকরা সঙ্গে থাকত, কাছে আসতে চাইত না সে,
বলত, কি-এক জ্যোতি দেখছি তোমার মুখে,
বেশি কাছে যেতে ভয় হয়। (১৯২)

হৃদের মা—আমার দিদি—
ফুলচন্দন দিয়ে পা-পুজো করত আমার।
একদিন এই শরীর-ভিতরের মা তার মাথায় পা দিয়ে বললে
কাশীতেই মৃত্যু হবে তোর।

সেজোবাবু বলেছিল, তোমার ভিতর আর কিছু নাই,
কেবল ঈশ্বর।
দেহটা কেবল খোলমাত্র, যেমন বাইরে কুমড়োর আকার
ভিতরে নেই শাঁস-বীচি।
তোমায় দেখলাম
যেন ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ। (৬৫৬)

সাধনা ও উপলব্ধির নানা পর্ব

ব্যাকুল হয়ে কাঁদতাম একলা-একলা।
কাঁদতাম—কোথায় নারায়ণ!
কাঁদতে-কাঁদতে অজ্ঞান—
মহাবায়ুতে লীন। (৯৪৮)

কি অবস্থা গেছে!
দেশে, চিনে শাঁখারী আর সমবয়সীদের বললাম—
ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার বল্ হরিবোল!
সকলের পায়ে পড়তে যাই।
চিনে বললে, তোর এখন প্রথম অনুরাগ,
তাই সব সমান বোধ।
প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে—
তখন আমগাছ তেঁতুলগাছ
মনে হয়—এক। (৩০১)

সাধনার সময়ে ধ্যান করতে-করতে কত কি দেখতাম!

বেলতলায় পাপ-পুরুষ এসে লোভ দেখাতে লাগল।
এসেছিল লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে।
টাকা, মান, রমণসুখ, নানারকম শক্তি—দিতে চাইল।
মাকে ডাকতে লাগলাম, তিনি দেখা দিলেন।
মাকে বললাম—ওকে কেটে ফেল।
মার সেই রূপ—ভুবনমোহিনী—
চাউনিতে যেন জগৎ নড়ছে।

ধ্যানের সময়ে দেখতে পেতাম—
একজন বসে আছে শূল হাতে ক'রে, ভয় দেখাচ্ছে—
যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি
মারবে শূলের বাড়ি।

ধ্যানের সময় প্রত্যক্ষ দেখলাম—
সামনে টাকার কাঁড়ি শাল, একথাল সন্দেশ,
দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদি নথ।
মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—
তুই কি চাস? ভোগ?
মন বললে—না,
ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া চাই না কিছু।
মেয়েদের ভিতর-বার দেখতে পেলাম সমস্তই,
যেমন কাঁচের ঘরের জিনিস দেখা যায় বাইরে থেকে।
দেখলাম ভিতরে—
নাড়িভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ
এইসব।

ধ্যানের সময়ে আরোপ করতাম—প্রদীপের শিখা,
হাওয়া নাই, একটুও নড়ছে না।
গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ,
মন আর বহির্মুখ নয়,
যেন বার-বাড়িতে পড়ল কপাট।
ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—
পড়ে রইল বাইরে।

কখনো মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন—
যখন মন নেমে আসত নিত্য থেকে লীলায়,

আবার উঠে যেত লীলা থেকে নিত্যে।
যখন লীলায় নামত—
তখন রাতদিন সীতারামের চিন্তা, রূপদর্শন,
সর্বদা বেড়াতাম রামলালাকে নিয়ে,
নাওয়াতাম, খাওয়াতাম।
আবার কখনো রাধাকৃষ্ণের ভাবে, সর্বদা তাঁদের রূপদর্শন।
কখনো গৌরাঙ্গের ভাবে, পুরুষ প্রকৃতিভাবের মিলন,
তখন গৌরাঙ্গের রূপদর্শন।

মহাভাবের পরে যেমন আনন্দ—
আগে যন্ত্রণা তেমনি।
মহাভাব তোলপাড় ক'রে দেয়।
সে অবস্থা যখন আসত —
শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে ফাল চালিয়ে দিত,
প্রাণ যায় যায়।
তারপর খুব আনন্দ।

মহাভাবের অবস্থায় ছিলাম তিনদিন।
নড়তে পারতাম না, পড়ে ছিলাম এক জায়গায়।
হুঁশ হলে আমাকে ধরে স্নান করাতে নিয়ে গেল বামনী,
হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না,
গা ঢাকা মোটা চাদরে,
তার উপর হাত দিয়ে ধরে নিয়ে গিছল আমায়।
গায়ে যে-মাটি লেগেছিল— গিয়েছিল পুড়ে।

সাধনার সময়ে প্রত্যক্ষ করলাম আত্মার রমণ।
আমার মতো একজন প্রবেশ করল আমার শরীরে,
রমণ করতে লাগল ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে।
মুদিত ষট্‌পদ্ম—
টক্‌টক্ রমণ করে আর প্রস্ফুটিত হয়।
ফুটে উঠল—
মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম—
এবং সহস্রারের পদ্মগুলি।

অবস্থা বদলে যেত।
লীলা থেকে নিত্যে গেল মন,

বোধ হল, সজ্‌নে তুলসী এক।
ঈশ্বরীয় রূপ ভালো লাগে না,
ঘরে যত পট—খুলে ফেলেছি সকলই,
কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—
অনাদি পুরুষের চিন্তা। (৫১৯-২৪)

তিনি আমায় সাধন করিয়েছেন নানা রূপে।
প্রথম পুরাণ মতের।
সাধনা করতাম পঞ্চবটীতে, ধ্যান করতাম তুলসীকাননে।
কখনো ডাকতাম ব্যাকুল হয়ে মা—মা
কখনো রাম—রাম ।
রাম রাম করবার সময়ে হয়ত হনুমানভাবে
বসে আছি ল্যাজ পরে, উন্মাদের অবস্থা।
সে সময়ে পূজা করতে-করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ,
পূজাতেই আনন্দ।
তন্ত্রমতে সাধন—বেলতলায়।
সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট, যা পড়ে আছে সমস্ত রাত্রি,
সাপে কি কিসে খেয়েছে ঠিক নেই,
তাই আহার।
কুকুরের উপর চড়ে লুচি খাওয়াতাম তাকে,
নিজেও খেতাম।
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।
মাটিতে জল জমবে, তাতে আচমন।
অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না—
তাই বাঘ হয়ে খেয়ে ফেলতাম অবিদ্যাকে।
বেদমতে সাধনের সময়ে সন্ন্যাস নিলাম,
পড়ে থাকতাম চাঁদনীতে,
হৃদুকে বলতাম, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনিতে ভাত খাব।
হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম।
মাকে বললাম, আমি মুখ্যু, তুমি জানিয়ে দাও আমায়—
বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে, নানা শাস্ত্রে, কী আছে?
মা বললেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।
বেদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে তন্ত্রে বলে, সচ্চিদানন্দ শিব,
পুরাণে বলে, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ।
যখন তাঁকে লাভ হয়—
বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র পড়ে থাকে নীচে। (৭৬০-৬১)

কেঁদে-কেঁদে বেড়াতাম একলা পথে—
মা, বজ্রাঘাত ক'রে দাও বিচারবুদ্ধিতে।
মা, জানিয়ে দাও।
তিনি সব জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন।
একদিন দেখালেন—শিব আর শক্তি—চতুর্দিকে।
মানুষ, জীবজন্তু, তরুলতা, সকলের ভিতর শিব আর শক্তি।
পুরুষ আর প্রকৃতি—এদের রমণ।
আর একদিন দেখালেন—নৃমুণ্ড স্তূপাকার, পর্বতাকার,
আর কিছুই নাই—
আমি তার মধ্যে একলা বসে।
দেখালেন
মহাসমুদ্র।
আমি লবণ-পুত্তলিকা, মাপতে যাচ্ছি,
মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় হয়ে গেলাম পাথর।
দেখলাম —জাহাজ একখানা,অমনি উঠে পড়লাম-
গুরু কর্ণধার।
আবার লাফ দিয়ে পড়ে মীন,
সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছি আনন্দে। (৬৬৫-৬৬)

কি অবস্থাই গেছে ! সামান্যতেই উদ্দীপন।
সুন্দরী পূজো করলুম, চৌদ্দ বছরের মেয়ে,
দেখলুম, সাক্ষাৎ মা।
রামলীলা দেখতে গেলুম।
দেখি, সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ।
যারা সেজেছিল পূজো করতে লাগলুম তাদের।
বকুলতলায় দেখি একদিন
নীলবসন-পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ্যা।
দপ্ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন।
দেখলুম সাক্ষাৎ সীতা, উদ্ধার হয়ে চলেছেন রামের কাছে।
অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য সমাধির অবস্থা।
গড়ের মাঠে গিছলুম বেড়াতে।
বেলুন উড়বে, অনেক লোকের ভিড়, হঠাৎ নজরে পড়ল,
সাহেবের ছেলে, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, ত্রিভঙ্গ।
যাই দেখা অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন।
সমাধি হয়ে গেল। (২৪৭-৪৮)

কখনো দেখতাম, জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ।
কখনো চারিদিকে পারার হ্রদ,
ঝক্‌ঝক্ করছে।
আবার কখনো রূপা-গলার মতো।
কখনো দেখতাম,
যেন জ্বলছে রঙমশালের আলো। (৭৬৫)

হৃষীকেশের সাধু এসেছিল , সে বললে--
কি আশ্চর্য, পাঁচ প্রকার সমাধি দেখছি তোমাতে!
কখনো কপিবৎ।
দেহবৃক্ষে মহাবায়ু বানরের ন্যায়,
ডালে-ডালে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সহস্রারে--
সমাধি।
কখনো মীনবৎ।
জলের ভিতর সুখে খেলে বেড়ায় মীন,
তেমনি দেহের ভিতরে মহাবায়ুর সঞ্চরণ, শেষে--
সমাধি।
কখনো পক্ষীবৎ।
মহাবায়ু দেহবৃক্ষের এ-ডালে ও-ডালে,
আগুনের মতো ডালগুলি,
ছেড়ে উঠে যায় সহস্রারে
সমাধি।
কখনো পিপীলিকাবৎ।
পিঁপড়ের মতো শিড়্ শিড় করে উঠতে থাকে মহাবায়ু,
সহস্রারে যেমনি পৌঁছায়
সমাধি।
কখনো তির্যগবৎ।
সর্পের ন্যায় মহাবায়ুর গতি আঁকাবাঁকা।
সহস্রারে গিয়ে
সমাধি। (৬১৫-১৬, ৮১৬, ২৫৪)

এক বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল।
মেঘ দেখে নাচত—ঝড়ে-বৃষ্টিতে খুব আনন্দ।
সর্বদা বিচার করত—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।
মায়াতে দেখায় নানারূপ,
তাই সে বেড়াত ঝাড়ের কলম নিয়ে।

ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে দেখায় নানা রঙ,
যদিও রঙ নাই কোনোই।
পাছে আসক্তি হয়—একবার বই দেখবে না কোনো জিনিস।
তিনদিন ছিল এখানে।
পোস্তার ধারে শানাইয়ের শব্দ শুনে একদিন বললে,
ব্রহ্মদর্শন যার হয়েছে—তার সমাধি হয় এই শব্দ শুনে। (২৬১-৬২)

আশ্চর্য সব দর্শন।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—তার ভিতরে বেড়া দেওয়া দুই থাক,
একদিকে কেদার চুনী ও অনেক সাকারবাদী ভক্ত,
অন্যদিকে টকটকে লাল সুরকির মতো জ্যোতি,
তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ !
তাই ভাবি, এই দেহের ভিতর মা লীলা করছেন ভক্ত লয়ে।
যখন প্রথম ঐ অবস্থা হল দেহ জ্বল্‌জ্বল্ করত জ্যোতিতে।
তখন বললুম, মা বাইরে প্রকাশ হয়ো না,
ঢুকে যাও ! ঢুকে যাও !
তাই এখন এই হীন দেহ।
নইলে জ্বালাতন করত, লোকে, ভিড় লেগে যেত।
এখন প্রকাশ নাই বাহিরে, আগাছারা পালায়,
যারা শুদ্ধসত্ত্ব থাকবে কেবল তারাই।
সাধ হয়েছিল—ভক্তের রাজা হব।
যে আন্তরিক ডাকবে ঈশ্বরকে, তাকে আসতেই হবে এখানে।
হচ্ছেও তাই।
তিনিই আছেন এর ভিতরে।
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ—একি আমার কর্ম !
স্বপনেও হল না স্ত্রীসম্ভোগ।
ন্যাংটা (তোতাপুরী) উপদেশ দিলে বেদান্তের।
তিন দিনেই সমাধি।
মাধবীতলায় ঐ অবস্থা দেখে ন্যাংটা হতবুদ্ধি,
বলেছিল—আরে এ কেয়া রে !
পরে সে বুঝেছিল—কে আছে এর ভিতর ! (৮১৮-১৯)

সমাধিতে কী বোধ হয়, বলা যায় না মুখে।
সমাধিভঙ্গের পরে যখন বলি—
ওঁ ওঁ—
তখন নেমে এসেছি একশো হাত। (১৩০)

মন লয় হয়ে যেত অখণ্ডে।
এমন কত দিন।
ভক্তি, ভক্ত, ত্যাগ করলুম সবই।
জড় অবস্থা।
দেখলুম, মাথাটা নিরাকার।
প্রাণ যায়-যায়।
যখন হুঁশ আসে--প্রাণ আটুপাটু নেমে আসার জন্য।
ভাবলুম, নেমে এসে থাকব কী নিয়ে?
মন দাঁড়াবে কোথায়?
তখন মন এল—ভক্তি ও ভক্তের উপর। (৩৮০)

উন্মত্ত আঁধার ঘরে

কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, পৈতেটা ফেললে কেন?
আমি বলেছিলুম, তোমার একবার উন্মাদ হয়
তাহলে বুঝবে।
সে অবস্থা হয়েছিল যখন
আশ্বিনের ঝড়ের মতো কি একটা এসে
কোথায় উড়িয়ে লয়ে গেল,
আগেকার চিহ্ন রইল না কিছুই।
কাপড় পড়ে যাচ্ছে, পৈতে থাকবে কেমন করে! (২০৮)

তখন উন্মাদ অবস্থা,
জ্ঞানোন্মাদ।
নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে বেড়াচ্ছি বাঁশ কাঁধে করে।
জাতিবিচার ছিল না।
কালীবাড়িতে কাঙালীরা খেয়ে গেল,
তাদের উচ্ছিষ্ট পাতা ঠেকালুম মাথায়, বুকে।
হলধারী বললে, করছিস কি, এঁটো খেলি কাঙালীর,
তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কি করে?
তাকে বললুম, তবে রে শালা, তুমি না গীতা বেদান্ত পড়ো,
তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,
সেই তুমি আবার ঠাউরেছ ছেলেপুলে হবে আমার?
তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। (৩০০)

দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে এক পাগল এসেছিল.
পূর্ণজ্ঞানী।
ছেঁড়া জুতো, হাতে কঞ্চি. এক হাতে একটি ভাঁড়. আঁবচারা।
গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে—
কোনো সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে।
তারপর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল।
মন্দির গিয়েছিল কেঁপে।
অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই.
তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই.
পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল— যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে।
হলধারী পেছু-পেছু গিয়েছিল. আর জিজ্ঞাসা করেছিল—
তুমি কে ? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী ?
তখন সে বলেছিল—
আমি পূর্ণজ্ঞানী। চুপ।
হলধারীর কাছে যখন শুনলুম সেকথা
বুক গুর্‌গুর্‌ করতে লাগল.
জড়িয়ে ধরলুম হৃদেকে।
মাকে বললুম. মা. ঐ অবস্থা কি আমারও হবে ?
সে যখন চলে গেল হলধারী সঙ্গে গিয়েছিল অনেকখানি।
ফটক পার হলে সে বলেছিল হলধারীকে
তোকে আর কি বলব. এই ডোবার জলে আর গঙ্গার জলে
যখন থাকবে না ভেদবুদ্ধি.
তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে। (৭০৭)

সকলই মা আনন্দময়ী

আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ
লাহাদের বাড়িতে কালীপুজো.
মার গলায় পৈতে দিয়েছে।
মার গলায় পৈতে কেন ? জিজ্ঞাসা করলে একজন।
যার বাড়ির ঠাকুর সে বললে—
ভাই তুই ঠিক চিনেছিস মাকে।
আমি তো জানিই না—মা পুরুষ কি মেয়ে ? (৯১৯)

মা দেখিয়ে দিলেন—তিনি সব হয়েছেন।

ঝাউতলা দিয়ে আসছি, পঞ্চবটীর দিকে দেখি-
সঙ্গে আসছে একটি কুকুর।
তখন পঞ্চবটীব কাছে একবার দাঁড়াই-
মা যদি কিছু বলান একে দিয়ে। (৯২১)

মহামায়ার মায়া যে কী—দেখালে একদিন।
ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতি, বাড়তে লাগল ক্রমে.
ঢেকে ফেলতে লাগল জগৎ।
আবার দেখালে—
যেন মস্ত দিঘি. পানায় ঢাকা. হাওয়াতে সরে গেল পানা.
দেখা গেল জল।
দেখতে-দেখতে চারদিকের পানা ধেয়ে এল. নাচতে-নাচতে,
আবার ঢেকে ফেলল।
জল যেন সচ্চিদানন্দ. পানা যেন মায়া.
মায়াব দরুণ দেখা যায় না সচ্চিদানন্দকে.
চকিতে হয়ত দেখা যায়.
আবাব ঢেকে ফেলে মায়াতে। (৮১৮)

দেখছিলাম ভগবতী মূর্তি-
পেটের ভিতর থেকে ছেলে বাব করছে
আবার ফেলছে গিলে।
ভিতরে যতটা যাচ্ছে ততটা শূন্য।
যেন বলছে. লাগ ! লাগ্ !—লাগ ভেল্‌কি লাগ ! (৮৩৫)

জগৎরূপে যিনি আছেন সর্বব্যাপী
তিনিই মা।
মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম.
মা বলতে-বলতে যেন-
টেনে আনতুম জগতের ঈশ্বরীকে। (৬৭১)

মুখ করতুম আকাশ-পাতাল-জোড়া.
আর বলতুম—'মা' !
যেন পাকড়ে আনছি মাকে.
যেন জাল ফেলে মাছ হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আনা।
গানে আছে, 'এবার কালী তোমায় খাব।' (৩১৭)

শরণ নিলাম

মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণ নিলাম পাদপদ্মে।
দেহসুখ চাইনা, লোকমান্য চাইনা, অষ্টসিদ্ধি চাই না।
কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়,
নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী ভক্তি।
আর যেন মা,
তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।
মা, তোমা বই আমার কেউ নেই।
আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন.
কৃপা ক'রে ভক্তি দাও—তোমার শ্রীপাদপদ্মে। (১৫৮)

কথা কওয়া কি ? কেবল ইশারা বই তো নয় !
কেউ বলছে, 'আমি খাবো।'
কেউ-বা বলছে, 'যা ! আমি তোর কথা শুনবো না।'
আচ্ছা মা, আমি যদিনা বলতাম—'আমি খাবো'—
তাহলে কি যেমন খিদে তেমনি থাকতো না ?
তোমাকে বললেই শুনবে তুমি,
আর ভিতরটা ব্যাকুল হলে শুনবে না-
তা কখনো হয় ?
তবে কথা বলি কেন ? কেন প্রার্থনা ?
যেমন করাও তুমি— তেমনি করি মা। (৭৬২)

ওঁ ওঁ ওঁ !
আমি কী বলছি !
মা, ব্রহ্মজ্ঞান দিও না আমায়,
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে দিও না আমায়।
আমি যে ভয়-তরাসে ছেলে, আমার যে মা চাই।
ব্রহ্মজ্ঞানকে কোটি নমস্কার।
ও যাদের দিতে হয় তাদের দাও গে।
আনন্দময়ী ! আনন্দময়ী ! (৬৭২)

তীর্থে তীর্থে

সিংহবাহিনী দেখতে গিছলুম।

চাষাধোপা পাড়ায় এক মল্লিকদের বাড়িতে দেখলুম ঠাকুরকে।
পোড়ো বাড়ি, তারা গরিব।
এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা,
ঝুরঝুর ক'রে ঝরছে বালি-শুরকি।
সেই পড়ো বাড়িতে কিন্তু জ্বলজ্বল্ করছে সিংহবাহিনীর মুখ।
আবির্ভাব মানতে হয়।

একবার গিছিলুম বিষ্ণুপুরে।
রাজার ঠাকুরবাড়িতে ভগবতীর মূর্তি, নাম মৃণ্ময়ী।
ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দিঘি, কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ!
দিঘিতে মাথা-ঘষা আঁবাঠার গন্ধ পেলুম।
তখন তো জানতাম না—
মেয়েরা মৃণ্ময়ী দর্শনের সময়ে তাঁকে আঁবাঠা দেয়।
ভাবসমাধি হয়েছিল।
আবেশে দিঘির কাছে মৃণ্ময়ী-দর্শন হল, কোমর পর্যন্ত।
তখনো বিগ্রহ দেখি নাই। (৭৬-৭৭)

মথুরবাবুর সঙ্গে গেছলুম বৃন্দাবনে, হৃদেও সঙ্গে ছিল।
সন্ধ্যার সময়ে বেড়াচ্ছি যমুনা পুলিনে।
বালির উপর ছোট-ছোট খড়ো ঘর, বড়-বড় কুল গাছ!
গোধূলি বেলা, গাভীরা ফিরছে গোষ্ঠ থেকে,
হেঁটে পার হচ্ছে যমুনা, সঙ্গে রাখাল।
যেই দেখা—
'কোথায় কৃষ্ণ' বলে অমনি বেহুঁশ।
তারপর দৌড়েছি উন্মত্তের মতো—
কৃষ্ণ কই ? কৃষ্ণ কই ?

পালকি ক'রে চলেছি শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পথে।
গোবর্ধন পর্বত দেখতে নামলাম পালকি থেকে,
তারপরেই ছুটেছি বিহ্বল হয়ে,
গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে বাহ্যশূন্য।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পথে—সেই মাঠ, গাছপালা, হরিণ।
চোখের জলে ভিজতে লাগল কাপড়,
কৃষ্ণ রে! সবই রয়েছে,
শুধু তোকে দেখতে পাচ্ছি না।

পাল্কির ভিতর বসে কথা কইবার শক্তি নাই,
হৃদে বলে দিল, বেয়ারাদের,
খুব হুঁশিয়ার।

নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত গঙ্গামায়ী,
অনেক বয়স, বড় যত্ন করত আমাকে,
অবস্থা দেখে বলত, ইনি সাক্ষাৎ রাধা, ডাকত 'দুলালী' বলে।
গঙ্গামায়ীর ভাব হত, দেখবার জন্য মেলা বসে যেত লোকের!
ইচ্ছা ছিল না দেশে ফিরতে ; সব ঠিক ঠাক, তাঁর কাছে থাকব,
তাঁর বিছানা এদিকে, আমার বিছানা ওদিকে।
হৃদে বললে, তোমার এত পেটের অসুখ দেখবে কে?
গঙ্গামায়ী বললে, কেন, আমি দেখব, সেবা করব!
হৃদে এক হাত ধরে টানে, গঙ্গামায়ী টানে অন্য হাত ধরে।
এমন সময়ে মনে পড়ল—মাকে।
মা সেই একলা আছে দক্ষিণেশ্বরে নবতে।
আর থাকা হল না।
বললুম—না, আমায় যেতে হবে। (৪৩৩-৩৪, ৬৫৯)

আমার আমি

আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য।
এতদূর দরকার নেই তোমাদের, পাঁচটা নিয়ে আছো তোমরা,
আমি আছি একটা নিয়ে।
ঈশ্বর বই আর কিছু ভালো লাগে না আমার।
মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই জানি না কিছুই। (৫২৫)

ভোগলালসা থাকা ভালো নয়, তাই মনে যা উঠত ক'রে নিতাম।
বড়বাজারে রং-করা সন্দেশ, দেখে ইচ্ছা হল খেতে,
এরা আনিয়ে দিলে, খেলুম খুব,
তারপর অসুখ।
নাথের বাগানে ছেলেবেলায় গঙ্গা নাইবার সময়ে
একটি ছেলের কোমরে দেখেছিলাম সোনার গোট।
সাধ হল, পরব।
তা বেশিক্ষণ কোমরে রাখবার জো নাই,
ভিতর থেকে শিড়্‌শিড়্ ক'রে উঠতে লাগল বায়ু—

সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনা!
খুলে ফেলতে হল একটু পরেই।
ধনেখালির খইচুর, কৃষ্ণনগরের সরভাজা,
খেতে সাধ হয়েছিল তাও।
শুনব শম্ভুর গান, রাজনারায়ণের চণ্ডী—
ইচ্ছা হয়েছিল।
পূরণ হল সে সবই।
সে সময় আসত সাধুরা।
সাধ হল, তাদের সেবার জন্য আলাদা ভাঁড়ার হোক।
সেজোবাবু তাই ক'রে দিলে।
একবার মনে উঠল, পরব ভালো জরীর সাজ,
আর তামাক খাব রূপার গুড়গুড়িতে।
সেজোবাবু পাঠিয়ে দিলে—জরীর সাজ, গুড়গুড়ি।
সাজ পরা হল, গুড়গুড়ি টানতে লাগলুম নানারকম ক'রে,
এপাশ থেকে ওপাশ, নীচু থেকে উঁচু।
মনকে বললাম, মন, এর নাম রূপার গুড়গুড়ি,
আর তাতে তামাক খাওয়া।
এই বলে ত্যাগ করলুম গুড়গুড়ি।
খুলে ফেললুম সাজ, মাড়াতে লাগলুম পা দিয়ে,
তার উপরে থুতু ফেলে বললুম—
এর নাম সাজ,
রজোগুণ হয় এই সাজে। (৭৫৩-৫৪)

পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলাম,
জপ ধ্যান করব বলে।
ইচ্ছা হল বাঁকারির বেড়া দেব।
তারপরেই দেখি,
জোয়ারে ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে
কতকগুলো বাঁকারির আঁটি, দড়ি।
যখন এই অবস্থা হল, পারলুম না পূজা করতে।
মাকে বললাম, আমার এমন শক্তি নাই যে ভার লই নিজের।
ইচ্ছা করে ভক্তদের খাওয়াতে,
কেউ সামনে পড়লে ইচ্ছা করে কিছু দিতে,
মা, এসব হবে কেমন ক'রে?
মায়ের ইচ্ছায় তাই তো সেজোবাবু এত সেবা করলে।
আবার বলেছিলুম—মা, আমার তো ছেলে হল না,

ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত ছেলে সঙ্গে থাকে।
তাই তো রাখাল এল। (২৭৪)

পঞ্চবটীর কাছে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বিচার ক'রে
টাকা ফেলে দিলুম গঙ্গায়।
তখন ভয় হল, যদি লক্ষ্মী রাগ করেন,
কেননা অবজ্ঞা করলুম তাঁর ঐশ্বর্য,
আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হব ?
তখন বললুম, মা, তোমাকে চাই, তোমায় পেলে সব পাব,
তুমি হৃদয়ে থাকো।
এইটুকু পাটোয়ারি।
একজনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবতী বললেন,
একটি বর নও।
বর একটি, কিন্তু লোকটি সেয়ানা।
সে বললে, মা তাহলে এই বর দাও—
আমি যেন ভাত খাই সোনার থালে
নাতির সঙ্গে।
এক বরে অনেক কিছু হল—
ঐশ্বর্য, আয়ু, নাতি।
এই পাটোয়ারি। (১৩৮, ৩২৬-২৭)

যেই বেজে উঠত আরতির শাঁখ ঘণ্টা
অমনি কুঠির ছাতে উঠে
ব্যাকুল হয়ে চীৎকার ক'রে বলতাম—
ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।
তোদের দেখাব জন্য আমার প্রাণ যায়। (৪৪৭-৪৮)

তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন ?
তোমরা রসে-বশে বেশ আছো —সা-রে-মা-তে।
তোমরা বেশ আছো।
নক্স খেলা জানো ?—একরকম তাস খেলা।
সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়।
আমি জ্বলে গেছি বেশি কাটিয়ে।
তোমরা খুব সেয়ানা।
কেউ দশে আছো, কেউ ছয়ে, কেউ পাঁচে।
তোমরা বেশি কাটাও নাই,

স্কুলে যাও নাই আমার মতো,
খেলা চলছে তোমাদের !
এতো বেশ। (৩৬, ৩১২)

আমার কথা লবে কে !
আমি সঙ্গী খুঁজছি—আমার ভাবের লোক।
খুব ভক্ত দেখলে মনে হয়—
এই বুঝি নেবে আমার ভাব।
কিন্তু দেখি, সে হয়ে গেল আর এক রকম।

সঙ্গী খুঁজছিল একটা ভূত।
শনি মঙ্গলবারে অপঘাত মৃত্যুতে ভূত হয়।
ভূতটা যেই দ্যাখে, ঐ রকম মরেছে কেউ—
অমনি ছুটে যায়—বুঝি সঙ্গী হল !
কিন্তু যেই কাছে যাওয়া—উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটি,
হয়ত অজ্ঞান হয়েছিল ছাদ থেকে পড়ে !

নরেন্দ্র যখন প্রথম আসে, বুকে হাত দিতে বেহুঁশ।
চৈতন্য হলে কেঁদে উঠল—
ওগো, আমার এমন করলে কেন ?
আমার যে বাবা আছে, মা আছে গো। (৫৩৯)

কলকাতায় যখন আসতাম—
হৃদে দেখাত লাটসাহেবের বাড়ি।
মামা, ঐ দ্যাখো, কত বড়-বড় থাম।
মা দেখিয়ে দিলে—
কতকগুলি মাটির ইঁট,
উঁচু করে সাজানো। (৯৫১)

একঘেয়ে কেন হব ?
আমি পাঁচরকম ক'রে মাছ খাই।
কখনো ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, কখনো ভাজায়।
কখনো পূজা, জপ, কখনো ধ্যান,
কখনো-বা তাঁর নাম গুণগান।
আবার কখনো নাচি তাঁর নাম ক'রে। (১৭৮)

আমার কোনো শালা চেলা নাই,
সকলের চেলা আমি।
ঈশ্বরের ছেলে সকলেই.
সকলেই ঈশ্বরের দাস।
ঈশ্বরের ছেলে আমিও,
আমিও ঈশ্বরের দাস। (১৭৮)

শরীর দুদিনের জন্য।
হাত ভেঙে গেল, মাকে বললুম, বড় লাগছে।
মা দেখিয়ে দিলে, গাড়ি আর তার ইঞ্জিনীয়ার।
আলগা হয়ে গেছে গাড়ির এক-আধটা স্ক্রু।
ইঞ্জিনীয়ার যেমন চালাচ্ছে, গাড়ি চলছে তেমনি.
নিজের ক্ষমতা নেই কোনোই।

তবে যত্ন করি কেন দেহের?
সম্ভোগ করব ঈশ্বরকে নিয়ে,
গাইব তাঁর নাম, গুণগান.
দেখে বেড়াব তাঁর জ্ঞানী, ভক্ত—
তাই। (৪৬৫)

হাঁ, আমার প্রায় একটু অহং থাকে
সোনার একটু কণা—
চাপ-এর উপর যতই ঘষো না কেন
একটু কণা থেকেই যায়।
যেমন বড় আগুন আর তার ফুলকি

চলে যায় বাহ্যজ্ঞান.
তবু একটু অহং রেখে দেন তিনি—
বিলাসের জন্য। (৬৮)

নিজের রোগ সারাবার কথাটা বলতে পারি না।
সেব্য-সেবক ভাবও কম পড়ে যাচ্ছে ইদানীং।
একবার হয়ত বলি—
মা, একটু মেরামত ক'রে দাও তরবারির খাপটা।
কিন্তু কম পড়ে যাচ্ছে সেরূপ প্রার্থনাও। (৯৮৮)

আজকাল খুঁজতে যাই—আমার 'আমি'।
পাই না খুঁজে।
দেখছি, তিনিই আছেন—
এই খোলটার ভিতরে। (৭০২, ৭৯৪)

চৈতন্য শুধু চৈতন্য

কি অবস্থাতেই রেখেছিল!
এক অবস্থা যায় তো আসে আর এক।
যেন ঢেঁকির পাট,
একদিক নীচু হয় তো অন্যদিক উঁচু।
অন্তর্মুখ সমাধিস্থ যখন—
তখনও দেখছি তিনি।
আবার মন যখন বাইরের জগতে—
তখনও তিনি।
আরশির এপিঠে দেখছি –
তিনি।
উল্টোদিকে দেখছি—
তিনি। (৭৬৬)

তিনি শুধু অন্তরে নন,
অন্তরে বাহিরে।
কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন মা—
সবই চিন্ময়।
প্রতিমা, বেদী, কোশাকুশি, চৌকাঠ, মার্বেল-পাথর,
এবং আমি,
সব চিন্ময়।
ঘরের ভিতর দেখি—
সব যেন রসে রয়েছে—সচ্চিদানন্দ-রসে।
কালীঘরের সম্মুখে দেখলাম এক দুষ্ট লোককে—
তার ভিতরও জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে তাঁর শক্তি। (৭০৯, ৬৪৮)

উন্মত্তের ন্যায় তখন পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম চতুর্দিকে,
যা দেখি পূজা করি তারই।
পূজার সময় বজ্র দিচ্ছি শিবের মাথায়,

দেখিয়ে দিলে—
বিরাটের মূর্তিই শিব।
বেলপাতা ছিঁড়তে গিয়ে উঠে এল খানিকটা আঁশ,
কষ্ট হল মনে।
ফুল তুলতে গেছি, দেখিয়ে দিলে—
গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল,
যেন বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া—
পূজা হয়ে গেছে বিরাটের।
উঠে গেল পূজা। (৪৬৪, ৩৬৭)

সে অবস্থায় কোনো প্রাণী মরলে
এক সান্ত্বনা—
বিনাশ হল তার দেহের,
আত্মার মৃত্যু নাই। (৮৮৯)

দেশ থেকে বর্ধমানে যাবার পথে
দৌড়ে গেলাম মাঠের পানে ;
দেখি, জীবেরা এখানে কেমন থাকে ?
দেখলাম, পিঁপড়ে চলেছে মাঠে,
সব স্থান চৈতন্যময়।
নানা ফুল, পাপড়ি থাক্‌-থাক্‌—
ছোট বিশ্ব—বড় বিশ্ব।
আমি হয়েছি—আমি এসেছি। (৬৫৪)

দেখলাম—এক চৈতন্য—অভেদ।
প্রথমে দেখালে—অনেক মানুষ, জীবজন্তু,
ইংরাজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, এইসব।
একজন মুসলমান, হাতে সানকি, তাতে ভাত,
সানকির ভাত সকলের মুখে দিলে একটু-একটু,
আস্বাদ করলুম আমিও।
আর একদিন দেখালে—
বিষ্ঠা, মূত্র, সেইসঙ্গে অন্ন ব্যঞ্জন, খাবার জিনিস নানারকম।
ভিতর থেকে জীবাত্মা হঠাৎ বেরিয়ে,
একটা আগুনের শিখার মতো,
জিহ্বা লক্‌লক্‌ করতে-করতে,
সব আস্বাদ করলে।

দেখালে—সব এক—অভেদ। (৪৪৭)

নৌকা যাচ্ছিল মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে—
হঠাৎ শিবদর্শন।
নৌকার ধারে আমি সমাধিস্থ।
যেন জগতের যত গম্ভীর সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে।
প্রথমে দেখলাম দূরে,
ক্রমে কাছে এল,
তারপর মিলিয়ে গেল আমার ভিতরে। (৮০২)

যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে :
তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ দ্যাখো—ওসব মনের ভুল।
অবাক হয়ে বললুম— কথা কয় যে রে!
নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়।
তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম :
মা, একি হল, এসব কি মিছে? নরেন্দ্র অমন বললে।
মা দেখিয়ে দিলে—
চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ।
মা বললে, যদি মিথ্যে হবে এসব মেলে কেমন করে?
তখন নরেন্দ্রকে বলেছিলাম—
শালা তুই অবিশ্বাস করে দিছিলি আমার। (৫৪১)

এখন আর ধ্যান-ট্যান করতে হয় না,
একেবারে বোধ হয়ে যায়—অখণ্ড।
এখন কেবল দর্শন! (৫৯৫)

আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন হয় না।
এখন সাকার নররূপ।
আমার স্বভাব—
ঈশ্বরের রূপ—দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গন।
এখন বলে দিচ্ছে, দেহধারণ করেছ তুমি,
আনন্দ করো সাকার নররূপ লয়ে। (৯৬৩)

চোখ বুজে ধ্যান করতুম।
ভাবলুম তারপর—
চোখ বুজলে ঈশ্বর আছেন, চোখ খুললে নাই?

চোখ খুললেও দেখছি—
ঈশ্বর সর্বভূতে—
মানুষ, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য, জলস্থল—
সর্বত্র। (৩১৩)

কে আমি

ভাবাবস্থায় দেখেছিলাম—
তিন চার ক্রোশব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ,
সেই মাঠে আমি একাকী।
চতুর্দিকে আনন্দের কুয়াশা।
তারই ভিতর থেকে উঠল তের-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে,
মুখটি দেখা যাচ্ছে।
দুজনই দিগম্বর।
আনন্দে দুজনে মাঠে দৌড়াদৌড়ি, আর খেলা। (৮৩৫)

এই পাখা যেমন দেখছি সামনে—প্রত্যক্ষ—
ঠিক অমনি দেখি তাঁকে।
দেখলাম—
তিনি, আর এই হৃদয়মধ্যে যিনি—
এক।
তবে একটি রেখামাত্র আছে—
ভক্তের আমি—
সম্ভোগের জন্য। (৬১৫)

এই মানুষ-লীলা কেন জানো ?
এর ভিতর দিয়ে শুনতে পাওয়া যায়—
তাঁর কথা। (৫৫৩)

এখানে আর কেউ নেই,
তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি—
এই বুঝেছি শেষে,
তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ,
তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস।
আবার এক-একবার ভাবি—
তিনিই আমি, আমিই তিনি। (৩২৬)

দেখলুম—
খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল,
বললে—
আমি যুগে-যুগে অবতার।
ভাবলুম—
বুঝি মনের খেয়াল।
চুপ করে থাকলাম।
তখন দেখি—আপনি বলছে—
শক্তির আরাধনা—চৈতন্যও করেছিল।
পূর্ণ আবির্ভাব—
তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। (৫।৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ
শ্রীম'র নয়নে ও মনে

অনন্তের আনন

দিগ্‌দিগন্তরব্যাপী মাঠ,
ধূ ধূ।
সম্মুখে পাঁচিল, দেখতে পাচ্ছি না তাই।
পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক,
ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অনন্ত মাঠের খানিক।
ঠাকুর! সেই ফাঁকটি আপনি,
আপনার ভিতর দিয়ে দেখা যায়—
দিগ্‌দিগন্তরব্যাপী মাঠ। (৫৭৯)

তিনি ও আমি

এ সৌম্য কে?
এঁর কাছে আবার ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছে।
বই না পড়িলে কি মহৎ হয় মানুষ?
অথচ এঁর বিষয়ে—কি আশ্চর্য কথা—
'বই-টই সব ওঁর মুখে।'
আবার আসিতে ইচ্ছা করিতেছে।
ইনিও বলিয়াছেন,
'আবার এসো।'
আসিব। (১৫)

মাস্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।
ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিলেন—
ঐ রে আবার এসেছে!
একটা ময়ূরকে আফিম খাইয়ে দিছিল বেলা চারটেয়।

ঠিক পরদিন চারটের সময়ে ময়ূরটা উপস্থিত।
তার এখন আফিমের মৌতাত,
ঠিক সময়ে এসেছে আফিম খেতে। (২৭)

একি দেখিতেছি!
নিশিদিন হরিপ্রেমে বিহ্বল।
বিবাহিত, কিন্তু পত্নীর সঙ্গে সংসার-সম্বন্ধ নাই।
পত্নীকে ভক্তি করেন, পূজা করেন,
তাঁহার সঙ্গে কেবলই ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ।
ঠাকুরের কাছে ঈশ্বরই বস্তু, আর সকল অবস্তু।
টাকার, সোনার, স্পর্শে শরীর বিকৃত, নিঃশ্বাস বুদ্ধ।
স্ত্রীলোকের স্পর্শে শিঙিমাছের কাঁটা-ফোটার ঝন্ঝন্ যন্ত্রণা।
এই দেখিতেছি!

আমি কি করিব, সংসারত্যাগ, পাঠত্যাগ?
কিন্তু বিবাহ করিয়াছি, সন্তান আছে, পরিবার প্রতিপালনের দায়।
আমার কি হইবে?
আমারও ইচ্ছা করে নিশিদিন হরিপ্রেমে মগ্ন থাকি। হায়!
রাত্রিদিন তৈলধারার ন্যায় ইনি নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তায় রত,
আর আমি রাত্রিদিন ছুটিতেছি বিষয়চিন্তায়।
আমার কি হইবে!

আমার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একস্থানে কেবল একটু জ্যোতি—
সে ইঁহার দর্শন।
ইনি নিজে করিয়া দেখাইয়াছেন।
তবু সন্দেহ?
'ভেঙে বালির বাঁধ পুরাই মনের সাধ।'
সত্যই যদি বালির বাঁধ, তবে ছাড়িতে পারি না কেন?
শক্তি কম?
যদি ভালবাসা আসে তখন তো হিসাবহারা।
জোয়ার-গাঙ্গের জল রোধ করে কে?
যে-প্রেমে ঈশা অনন্যচিন্তায় বনবাসী, পিতৃমুখ স্মরণে দেহত্যাগী,
যে-প্রেমে বুদ্ধ রাজ্যত্যাগী বৈরাগী,
শ্রীগৌরাঙ্গ কৌপীনবন্ত উন্মাদ,
সে প্রেমের একবিন্দু উদয়ে কোথায় থাকে অনিত্য সংসার!
কিন্তু যারা দুর্বল, সংসারী, পায়ে মায়ার বেড়ি,

সে প্রেম আসেনি যাদের,
তাদের কী উপায় !
আমি সেই।
আমার কি উপায় ?
সে যাই হোক, এই প্রেমিক বৈরাগীর সঙ্গত্যাগ নয়।
দেখি কি হয়। (৮৮)

চলো যাই—
প্রেমোন্মত্ত বালককে দেখিতে যাই।
মহাযোগী,
অনন্ত সাগরের তীরে একাকী.
সে সাগরে কী যেন দেখিতেছেন—
দেখিয়া উন্মত্ত। (২২৭)

সন্ধ্যা হইল।
সিন্ধুবক্ষে যেখানে নীল ছায়া অনন্তের,
নিবিড় অরণ্যমধ্যে, অম্বরস্পর্শী পর্বতশিখরে,
বায়ুবিকম্পিত নদীর তীরে,
দিগ্‌দিগন্তরব্যাপী প্রান্তরমধ্যে—
সন্ধ্যা হইল।
চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন সূর্য,
কোথায় গেলেন !
সন্ধ্যা হইল।
কি আশ্চর্য, কে এরূপ করিল ?
পাখিরা শাখা আশ্রয় করিয়া রব করিতেছে।
মানুষের মধ্যে যাঁহাদের চৈতন্য হইয়াছে
তাঁহারাও সেই আদি কবি-কারণের কারণ
পুরুষোত্তমের নাম করিতেছেন।
সন্ধ্যা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখন মধুর নাম করিতেছেন।
সকলে উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ,
এমন মিষ্ট নাম কখনো শোনেন নাই।
এমন প্রেমমাখা বালকের মা-মা ডাক
তাঁহারা দেখেন নাই।
আকাশ, পর্বত, মহাসাগর, প্রান্তর, অরণ্য—

দেখিবার কী প্রয়োজন !
ইঁহাকে দেখিতেছি।
দেখিতেছি ভক্তদের—শান্ত ও আনন্দময়।
সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তিলাভ করিল ?
নিরানন্দ ধরা কিসে ভাসিল আনন্দে ?
এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর ?
হউন বা না-হউন, মন বিকাইয়াছে ইঁহারই চরণপ্রান্তে,
ইঁহারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
দেখি, ইঁহার হৃদয়-সরোবরে সেই আদিপুরুষ
কিরূপ প্রতিবিম্বিত ! (১৫৭-৫৮)

আনন্দের হাট।
আনন্দময় ঠাকুরের ঈশ্বরপ্রেম মুকুরিত ভক্তমুখদর্পণে।
শুধু ভক্তমুখদর্পণে ?
উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে, প্রস্ফুটিত কুসুমে, ভাগীরথীবক্ষে,
রবিকরদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে,
গঙ্গাকণাবাহী শীতল সমীরণে—
প্রতিভাসিত আনন্দ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
উদ্যানের ধূলি পর্যন্ত মধুময়।
ইচ্ছা হয়, গড়াগড়ি দিই, এই ধূলিতে,
ইচ্ছা হয়, সারাদিন দর্শন করি মনোহারী গঙ্গাবারি,
ইচ্ছা হয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে
আত্মীয়জ্ঞানে সম্ভাষণ করি, বাঁধি প্রেমালিঙ্গনে।
এই ধূলির উপর দিয়া পাদচারণ করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ,
এই বৃক্ষ-লতা-গুল্মের মধ্য দিয়া
তিনি যাতায়াত করেন অহরহ।
ইচ্ছা করে, অনন্যদৃষ্টে তাকাইয়া থাকি জ্যোতির্ময় গগনপানে,
কেননা দেখিতেছি,
দ্যুলোক ভূলোক ভাসিতেছে প্রেমানন্দে।
ঠাকুরবাড়ির পূজারী, দৌবারিক, পরিচারক—
সকলকেই কেন বোধ হইতেছে পরমাত্মীয় !
কেন এই স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর !
আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম,
ভক্তগণ, সেবকগণ,
সকলে যেন এক জিনিসে তৈয়ারী !

শ্রীরামকৃষ্ণ যাহাতে নির্মিত—
এ'রাও বোধহয় সেই একই জিনিসের !
যেন একটি মোমের বাগান,
বাগানের পথ, মালী, ঘর, লোকজন—
সমস্তই মোমের।
এখানকার সবই গড়া আনন্দ দিয়ে—আনন্দে। (১৩২-৩৩)

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়।
তুমি সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত করিলে।
সকল ধর্মাবলম্বীদের আলিঙ্গন করিলে পরমাত্মীয় জ্ঞানে।
হিন্দুর যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে—
সে আত্মীয় তোমার।
মুসলমানের যদি আল্লায় ভক্তি থাকে—
সে আত্মীয় তোমার।
খ্রীস্টানের যদি যীশুতে ভক্তি থাকে—
সে আত্মীয় তোমার।
তুমি বলো, সব নদীই ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া
পড়িতেছে এক সমুদ্রমধ্যে—
সকলেরই উদ্দেশ্য—এক সমুদ্র।

তোমার শ্রীমুখে শুনিলাম—
এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হইতেছে, মহা চিদাকাশে,
আবার লয় হইতেছে কালে,
মহাসমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে।
আনন্দসিন্ধুতীরে অনন্ত লীলালহরী।
এ লীলার আদি কোথায়—কোথায় অন্ত ?
মুখে বলিবার জো নাই, মনে চিন্তা করিবার জো নাই।
মানুষ কতটুকু ? তাহার বুদ্ধি-বা কতটুকু ?
শুনিলাম, মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হইয়া দর্শন করিয়াছেন—
পরম পুরুষকে।
অবশ্য করিয়াছেন, কেননা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন।
তবে চর্মচক্ষে নয়,
যাহাকে বলে দিব্যচক্ষু, তাহার দ্বারা।
দিব্যচক্ষু পাইয়া অর্জুন দেখিয়াছিলেন।
ঈশা তাহারই দ্বারা দর্শন করিতেন।
ঋষিরা তাহাতে সাক্ষাৎ করিয়াছেন আত্মার।

সে চক্ষু হয় কিসে ?
ঠাকুরের মুখে শুনিলাম—ব্যাকুলতার দ্বারা।
সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করিয়া ?
কই আজ তো তাহা বলিলেন না ! (১৫০)

অনেক রাত হইয়াছে।
ফাল্গুনের কৃষ্ণাসপ্তমী, অন্ধকার রাত্রি।
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে যাইবেন।
ভক্তেরা গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া।
তিনি গাড়িতে উঠিতেছেন, সন্তর্পণে উঠানো হইতেছে।
গর্গর মাতোয়ারা।
গাড়ি চলিয়া গেল।
ভক্তেরা যে যার বাড়ি যাইতেছেন।
মস্তকের উপর তারকামণ্ডিত নৈশ গগন,
হৃদয়পটে অদ্ভুত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি,
স্মৃতিমধ্যে ভক্তের মজলিশ, সুখস্বপ্নের ন্যায় প্রেমের হাট।
কলকাতার রাজপথে ভক্তেরা।
সরস বসন্তানিল সেবন করিতে-করিতে কেহ গাহিতেছেন-
'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিলে প্রাণ।'
মণি ভাবিতেছেন, সত্যই কি ঈশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ করেন,
অনন্ত ঈশ্বর কি চৌদ্দপোয়া মানুষ হন,
অনন্ত কি সান্ত হয় ?
ঠাকুর তো বলেন, যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ বস্তুলাভ নাই।
তাও বটে ! এক ছটাক বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিব ?
তবে অবতারে বিশ্বাস হয় কিরূপে ?
ঠাকুর বলিয়াছেন, ঈশ্বর যদি দপ্‌ ক'রে দেখিয়ে দেন
তাহলে বোঝা যায় এক দণ্ডেই।
গ্যেটে মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছেন, লাইট মোর লাইট।
যদি তিনি দপ্‌ করিয়া আলো জ্বালিয়া দেন—
'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'
যেমন প্যালেস্টাইনের মূর্খ ধীবরেরা যীশুকে—
যেমন শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরাঙ্গকে—
পূর্ণাবতার দেখিয়াছেন।
কিন্তু যদি দপ্‌ করিয়া না দেখান ?
ঠাকুর শিখাইয়াছেন—বিশ্বাস ! বিশ্বাস !
ঠাকুরের বাক্যে ঈশ্বরকৃপায় আমার বিশ্বাস হইয়াছে।

অন্যে যা করে করুক, আমি দেবদুর্লভ বিশ্বাস কেন ছাড়িব ?
বিচার থাক।
জ্ঞানচর্চা করিয়া কি আর একটা ফাউস্ট হইব ?
আমি কি একাকী ঘরের মধ্যে থাকিয়া,
হায় কিছুই জানিতে পারিলাম না, বৃথা পড়িলাম বিজ্ঞান-দর্শন,
এই জীবনে ধিক্—
এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিব ?
অথবা আমি একজন অ্যালাস্টরের মতো
অজ্ঞানের বোঝা বহিতে না পারিয়া,
শিলাখণ্ডের উপর মাথা রাখিয়া প্রতীক্ষা করিব মৃত্যুর ?
না, ঐ সব ভয়ানক পণ্ডিতের মতো এক ছটাক জ্ঞান দ্বারা
রহস্যভেদ করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই।
এক সের বাটিতে চার সের দুধ ধরিল না বলিয়া
মরিতে যাইবার দরকার নাই।
বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।
হে ভগবান, বিশ্বাস দাও আমাকে,
মিছামিছি ঘুরাইও না। (১৬৪-৬৫)

তিনি—রূপে রূপে

রাসমণির কালীবাড়ির বৃহৎ প্রাঙ্গণ।
পূর্বাংশে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির।
পশ্চিমাংশে সারি-সারি দ্বাদশ শিবমন্দির।
উত্তরে পরমহংসদেবের ঘর।
ঘরের পশ্চিমে অর্ধমণ্ডলাকার বারান্দা,
সেখানে দাঁড়াইয়া গঙ্গাদর্শন করেন।
গঙ্গার পোস্তা ও বারান্দার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে
বহুদূরব্যাপী পুষ্পোদ্যান, উত্তরে পঞ্চবটী পর্যন্ত বিস্তৃত,
সেখানে তপস্যা করিয়াছেন ঠাকুর।
তাঁহার ঘরের কোলে দু'একটি কৃষ্ণচূড়ার গাছ।
নিকটে গন্ধরাজ, কোকিলাক্ষ, শ্বেত ও রক্ত করবী।
ঘরের ভিতরে দেওয়ালে ঠাকুরদের ছবি,
তার একটি, 'পিটার জলমধ্যে ডুবিতেছেন, যীশু হাত ধরিয়া তুলিতেছেন
প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্তিও আছে।
তক্তপোষের উপর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব উত্তরাস্য উপবিষ্ট।

ভক্তেরা মেঝেয়, কেহ মাদুরে, কেহ আসনে।
সকলেই একদৃষ্টে দেখিতেছেন মহাপুরুষের আনন্দমূর্তি।
অনতিদূরে পূতসলিলা গঙ্গা, দক্ষিণবাহিনী,
বর্ষাকালে খরস্রোতা, সাগরসঙ্গমে পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত।
পথে কেবল মহাপুরুষের ধ্যানমন্দির দর্শন-স্পর্শন করিয়া যাইতেছে। (৬৯)

ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথা পান করিতেছে।
কথাগুলি যেন নানা বর্ণের মণিরত্ন, যে যত পারেন কুড়াইতেছেন।
কোঁচড় পরিপূর্ণ, এত ভার যে ওঠা যায় না।
সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ের যত সমস্যা,
সমাধান করিতেছেন সকলেরই।
পদ্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ সরস্বতী—
এই সব শাস্ত্রবিদেরা অবাক।
এঁর সমাধি দর্শনে দয়ানন্দ আক্ষেপে বলিয়াছেন—
'আমরা বেদ-বেদান্ত পড়েছি কেবল,
এঁতে দেখছি তার ফল।
এঁকে দেখে বোঝা গেল শাস্ত্র মন্থন ক'রে
পণ্ডিতেরা কেবল খান ঘোল, ইনি খান মাখনটুকু।'
ইংরাজী-পড়া কেশব সেনরাও অবাক।
তাঁরা ভাবেন, কি আশ্চর্য, এই নিরক্ষর ব্যক্তি বলছেন এইসব?
এ যে ঠিক যীশুখ্রীস্টের কথা।
সেই গ্রাম্য ভাষা, সেই গল্প করে বোঝানো,
যাতে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বুঝতে পারে অনায়াসে।
যীশু পাগল হয়েছিলেন 'পিতা পিতা' বলে,
ইনি পাগল 'মা মা' করে।
শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নয়—
ঈশ্বর প্রেম।
'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।'
যীশুর মতো ত্যাগী, তাঁরই মতো জ্বলন্ত বিশ্বাস,
তাই কথাগুলিতে এত জোর।
কেশব সেনাদি পণ্ডিতেরা আরও ভাবেন,
নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব হয় কিরূপে?
কি আশ্চর্য, কোনো বিদ্বেষভাব নাই,
আদর করেন সব ধর্মাবলম্বীদের,
ঝগড়া নাই কারো সঙ্গে—
আশ্চর্য। (১৪০-৪১)

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।
কেবল ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ,
গঙ্গায় কুলুকুলু ধ্বনি।
ঠাকুর এবার রেল পার হইয়া, পঞ্চবটীর মধ্য দিয়া,
নিজের ঘরের দিকে যাইতেছেন।
পঞ্চবটীতে আসিয়া, পূর্বাস্য হইয়া,
বটমূলে চাতালে মস্তকস্পর্শে প্রণাম করিলেন।
সাধনার এই স্থান।
এখানে কত ব্যাকুল ক্রন্দন, ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন,
এখানে কত কথা মার সঙ্গে।
তাই কি ঠাকুর এখানে যখনই আসেন—
প্রণাম করেন? (৬৫৭)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবিত।
বুঝি দেখিতেছেন—
সাক্ষাৎ নারায়ণ রাখাল-দেহ ধরিয়া আসিয়াছেন।
প্রেমভরে বলিতেছেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ!
তারপরেই সমাধি।
শবার চিত্রার্পিত, স্থির,
নাসিকাগ্রে দৃষ্টি, নিশ্বাস বহিছে কি না বহিছে।
আত্মাপক্ষী বুঝি বিচরণ করিতেছে—চিদাকাশে। (৬৬-৬৭)

পথিমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরের ভাবাবস্থা।
ভাবে বলিতেছেন—
'আমি মালা জপবো? হ্যাক থু।
এ শিব পাতাল-ফোঁড়া,
স্বয়ম্ভূলিঙ্গ।' (৩২৯)

মঙ্গল উৎসব প্রাঙ্গণে

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আরম্ভ হইল।
বেদীর উপরে আচার্য, সম্মুখে সেজ।
পরব্রহ্মের উদ্দেশে আচার্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন বেদোক্ত মহামন্ত্র।
ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে বলিতে লাগিলেন
পুরাতন আর্যঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—

'সত্যং জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম, আনন্দরূপমৃতম্ যদ্বিভাতি,
শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ ।'
অনেকের অন্তরের বাসনা নির্বাপিতপ্রায়,
চিত্ত অনেকটা স্থির, চক্ষু মুদিত ।
পরমহংসদেব বসিয়া আছেন চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ।
আত্মাপক্ষী কোথায় বিচরণ করিতেছে আনন্দে—
শূন্য মন্দিরে পড়িয়া আছে দেহটি মাত্র । (৮৩)

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে আসিয়াছেন ।
প্রবেশ করিয়া মনে হয় যেন পূজাবাড়ি—রাত্রিকালে যাত্রা হইবে ।
চারিদিক আনন্দে পরিপূর্ণ,
শরৎকালের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত ।
আকাশ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা যেন একতানে গান করিতেছে—
'আজি কি হরষ-সমীর বহে প্রাণে—ভগবৎ মঙ্গল কিরণে ।'
সকলেই যেন ভগবৎ-দর্শন পিপাসু ।
এমন সময়ে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের গাড়ি উপস্থিত সমাজগৃহে ।
ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে গৃহমধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন ।
সব চক্ষু এককালে সেই আনন্দমূর্তির উপর পতিত ।
যতক্ষণ নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ না হয়—
ততক্ষণ দর্শকবৃন্দের কেহ হাসিতেছে,
কেহ বিষয়কর্মের কথা কহিতেছে,
কেহ বাহিরে একাকী অথবা বন্ধুসঙ্গে পাদচারণ করিতেছে,
কেহ পান খাইতেছে, কেহ-বা-তামাক,
যাই ড্রপসিন উঠিল, অমনি সকলে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া,
অনন্যমন হইয়া,
একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল নাট্যরঙ্গ । (৪৪-৪৫)

সিঁথির ব্রাহ্মভক্তরা ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইলেন ।
কার্তিক মাস, শুক্লা প্রতিপদ তিথি, ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ ।
শরতের মহোৎসব ।
বেণীমাধব পালের মনোহর উদ্যানবাটীতে অধিবেশন ।
শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বেলা চারিটার সময় আসিয়া পৌঁছিলেন ।
বাগানের মধ্যে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইলে
দলে-দলে ভক্ত ঘেরিয়া ফেলিল ।
মহোৎসব উপলক্ষে সমাজগৃহের বিচিত্র শোভা ।
কোথাও নানা বর্ণের পতাকা, আন্দোলিত,

কোথাও-বা নয়নরঞ্জন বৃক্ষপল্লব,
সম্মুখের সরোবরে স্বচ্ছ সলিলমধ্যে প্রতিভাসিত শরতের সুনীল নভোমণ্ডল।
আজ ভক্তরা আবার শুনিবেন
ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদধ্বনি,
যে-ধ্বনি আর্য ঋষিদের মুখে হইতে একদা বেদাকারে বহির্গত,
যে-ধ্বনি পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আকারে এককালে নির্গত,
যে-মেঘগম্ভীর ধ্বনির মধ্যে বিনয়নম্র ব্যাকুল কৌন্তেয়
এই কথামৃত পান করিয়াছিলেন,
'কবিং পুরাণমনুশাসিতারমোণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।'

আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের সুন্দব বেদীর প্রতি
প্রণাম করিলেন নতশিরে।
বেদী হইতে ভগবানের কথা হয়, তাই বেদী পুণ্যক্ষেত্র।
শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য এবার গান করিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, হ্যাঁগা, ঐ গানটি তোমার বেশ,
'আমায় দে মা পাগল করে',
ঐ গানটি গাও না।
গান শুনিতে-শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল।
'উপেক্ষিয়া মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
সর্বাতীত তত্ত্ব দেখি আপনি আপনে।'
কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
সমস্তই যেন মুছিয়া গিয়াছে।
একদিন ভগবান পাণ্ডবনাথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া
যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ কাঁদিয়াছিলেন।
আর্যকুলগৌরব ভীষ্ম তখন শরশয্যায় শায়িত, ভগবানের ধ্যাননিরত,
তখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সবে সমাপ্ত, সহজেই কাঁদিবার দিন,
শ্রীকৃষ্ণের সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া
পাণ্ডবেরা কাঁদিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন —
বুঝি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। (১১৮)

ঠাকুর পানিহাটির বৈষ্ণব মহোৎসবে যাইতেছেন।
সোমবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী, ১৮ জুন, ১৮৮৩।
দাস রঘুনাথ প্রথম এই মহোৎসব করেন।
রঘুনাথকে নিত্যানন্দ-প্রভু বলিয়াছিলেন—
ওরে চোরা, তুই বাড়ি থেকে কেবল পালিয়ে-পালিয়ে আসিস,

আর চুরি ক'রে আস্বাদ করিস প্রেম,
আজ দণ্ড দিব তোকে,
চিঁড়ার মহোৎসব ক'রে সেবা কর ভক্তদের।
রাঘব পণ্ডিত তাহার পর উৎসব করিয়াছেন বর্ষে-বর্ষে।
এখনও চলিতেছে।
ঠাকুর প্রায়ই আসিয়াছেন এই উৎসবে।
রাম দত্ত কলিকাতা হইতে গাড়ি আনিয়াছিলেন,
ভক্তসঙ্গে ঠাকুর তাহাতেই পেনেটি চলিলেন।
পথে যাইতে-যাইতে ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে
অনেক ফস্টিনস্টি।

উৎসবস্থলে গাড়ি পৌঁছিবামাত্র—
অদ্ভুত কাণ্ড!
গাড়িতে বসিয়া ঠাকুর এই আনন্দ করিতেছিলেন,
হঠাৎ একাকী নামিয়া ছুটিয়াছেন তীরের মতো।
ভক্তরা খুঁজিতে-খুঁজিতে দেখিলেন—
অপূর্ব!
বহুলোক সমাকীর্ণ রাজপথে
নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনদলমধ্যে
নৃত্য করিতেছেন ঠাকুর।
মাঝে-মাঝে সমাধিস্থ।
পাছে পড়িয়া যান, নবদ্বীপ গোস্বামী ধরিয়া আছেন অতি যত্নে
চতুর্দিকে ভক্তদের হরিধ্বনি,
তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ,
তাঁহাকে নিকটে দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি।

অর্ধবাহ্যদশায় ঠাকুর নৃত্য করিয়াছেন,
বাহ্যদশায় গান ধরিলেন—

'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা দুভাই এসেছে রে!
যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়
তারা দুভাই এসেছে রে!
মার খেয়ে প্রেম যাচে যারা
তারা দুভাই এসেছে রে!'

ঠাকুরের সঙ্গে উন্মত্তের মতো নাচিতেছেন সকলেই।
ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

'নদে টলমল টলমল করে
গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে !'

কীর্তনতরঙ্গ চলিল রাঘব-মন্দিরের দিকে।
সেখানে পরিক্রমণ, নৃত্যের পরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রণাম।
এবার কীর্তনতরঙ্গ চলিল গঙ্গাকূলে রাধাকৃষ্ণ বাড়ির দিকে।
তরঙ্গায়িত জনসংঘ, উঠিতেছে, পড়িতেছে।
কিন্তু অধিকাংশই প্রবেশ করিতে পারিল না,
দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতে লাগিল।

রাধাকৃষ্ণের আঙিনায় নৃত্য করিতেছেন ঠাকুর,
কীর্তনানন্দে গর্গর মাতোয়ারা।
পুষ্প ও বাতাসা মুহুর্মুহু পড়িতেছে, চরণতলে,
হরিনামের রোল আঙিনা হইতে উঠিয়া, রাজপথে পৌঁছিয়া,
সহস্র-সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত।
ভাগীরথীবক্ষে নৌকারোহীরা অবাক,
সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি।
নিজেরাও হরিবোল, হরিবোল, বলিয়া
শব্দে শব্দ মিলাইল। (৬৩৭-৩৯)

ঠাকুর যদুমল্লিকের বাড়ি আসিয়াছেন।
আষাঢ়, কৃষ্ণ প্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী।
সিংহবাহিনীর নিত্যসেবার ঘরে ঠাকুর উপস্থিত।
সচন্দন পুষ্পমাল্যে অর্চিত মা, অপূর্ব শ্রী।
প্রতিমার সামনে আলো জ্বলিতেছে,
ঠাকুর হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া,
পশ্চাতে ভক্তগণ।
ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন,
দর্শন করিতে-করিতে প্রস্তরমূর্তির ন্যায় নিশ্চল,
নয়ন পলকশূন্য।
অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস।
যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন—
'মা, আমি গো !'
কিন্তু চলিতে পারিতেছেন না—
রামলালকে বলিতেছেন, 'তুমি ঐটি গাও, তবে ভালো হব।'
রামলাল গাহিতেছেন—'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।'

গান সমাপ্ত হইল।
এইবার ঠাকুর আসিতেছেন বৈঠকখানার দিকে।
আসিবার সময় বলিতেছেন—
'মা, আমার হৃদয়ে থাকো মা।' (৪৪১)

বৃহস্পতিবার, আষাঢ়, শুক্লা দশমী, তেসরা জুলাই, ১৮৮৪।
আজ জগন্নাথের পুনর্যাত্রা।
শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়িতে সেবা আছে—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের,
একখানি ছোট রথও আছে।
তিনি ঠাকুরকে আনিয়াছেন।
বারবাড়িতে দোতলার চকমিলানো বারান্দায়
ছোট রথখানি টানা হইবে।
রথ আনা হইয়াছে দোতলার বারান্দায়।
শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্পমালায় সুশোভিত।
শ্রীযুক্ত বলরামের সাত্ত্বিক পূজা, আড়ম্বর নাই,
বাহির লোকও জানে না যে বাড়িতে রথ।
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে এখন রথের সম্মুখে,
রথের দড়ি ধরিয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ টানিলেন।
পরে গান ধরিলেন—

নদে টলমল টলমল করে
গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে !!···

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন।
সঙ্গে ভক্তরা নাচিতেছেন, গাহিতেছেন,
যোগ দিয়াছেন কীর্তনীয়া,
দেখিতে-দেখিতে সমস্ত বারান্দা পরিপূর্ণ,
নিকটস্থ ঘর হইতে নৃত্য দেখিতেছেন মেয়েরা,
বোধ হইল, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ—
নৃত্য করিতেছেন—শ্রীবাসমন্দিরে। (৭০৪, ৭১২)

তাঁহারে আরতি করে

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল, সন্ধ্যা হয়-হয়।
ঠাকুরবাড়ির ফরাস আলোর আয়োজন করিতেছে।
কালীঘর ও বিষ্ণুঘরের দুই পূজারী,
গঙ্গায় অর্ধনিমগ্ন থাকিয়া শুচি করিতেছেন বাহ্য ও অন্তর।

শীঘ্র তাঁহাদের আরতি করিতে ও রাত্রির শীতল দিতে হইবে।
দক্ষিণেশ্বরের যুবকবৃন্দ বাগানে বেড়াইতে আসিয়াছে,
হাতে ছড়ি, সঙ্গে বন্ধু, পোস্তায় ঘুরিতেছে।
শ্রাবণ মাসের খরস্রোতা গঙ্গাপ্রবাহ, ঈষৎ বীচিবিকম্পিত।
যাঁহারা চিন্তাশীল, পঞ্চবটীর বিজন ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন।
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমে বারান্দায় আসিলেন গঙ্গাদর্শনে।

সন্ধ্যা হইল।
ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল।
শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া ধূনা দিল দাসী।
আরতি আরম্ভ হইল—
দ্বাদশ শিবমন্দিরে, বিষ্ণুঘরে, কালীঘরে।
কাঁসর, ঘড়ি ও ঘণ্টার মধুরগম্ভীর নিনাদ, আর গঙ্গার কলনাদ।
শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদ, চাঁদ উঠিয়াছে,
বৃহৎ উঠান ও উদ্যানের বৃক্ষশীর্ষ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত,
জ্যোৎস্নাসলিলে ভাগীরথীর আনন্দধারা।

সন্ধ্যার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে নমস্কার করিয়া হরিধ্বনি করিতেছেন।
কক্ষে নানা ছবি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রামরাজা, রাধাকৃষ্ণ, মা-কালী।
সকলের নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন, বলিতেছেন—
ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান,
ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম,
বেদ, পুরাণ তন্ত্র, গীতা, গায়ত্রী,
শরণাগত, শরণাগত,
নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। (৮০-৮১)

আরতি হইতেছে।
যাঁহারা পোস্তায় বা পঞ্চবটীতে পাদচারণ করিতেছেন,
তাঁহারা দূর হইতে শুনিতেছেন আরতির ঘণ্টানিনাদ।
জোয়ার আসিয়াছে।
আরতির মধুর শব্দ, ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দে মিশিয়া—
আরও মধুর।
এই সকলের মধ্যে বসিয়া আছেন—
প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।
হৃদয় মধুময়।
মধু! মধু! মধু! (৬২৮)

ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেল।
আরতি হইতেছে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে।
আরতির শব্দ শুনিয়া কাঙাল, সাধু, ফকির,
ছুটিয়া আসিতেছেন অতিথিশালায়।
কারু হাতে শালপাতা, কারু হাতে-বা তৈজসপত্র, থালা, ঘটি।
প্রসাদ পাইলেন সকলেই (২৯০)

আরতি হইতেছে।
রোশনচৌকির সুমধুর নিনাদ।
নহবৎখানায় সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী।
আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব।
যেন জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে,
কেহ নিরানন্দ হইও না।
ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই, থাকে থাকুক,
আমাদের মা আছেন,
আনন্দ করো।
দাসীপুত্র ভালো খেতে পায় না, পরতে পায় না,
বাড়ি নাই, ঘর নাই,
তবু বুকে জোর আছে—
তার যে মা আছে।
পাতানো মা নয়, সত্যকার মা।
মায়ের ছেলেরা, সব আনন্দ করো।   (১৪৮)

চন্দ্রালোকে : আনন্দসিন্ধুতীরে

ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী,
ছয়-সাতদিন পরে পূর্ণিমার দোল-মহোৎসব।
সন্ধ্যা হইল,
মন্দিরশীর্ষ, প্রাঙ্গণ, উদ্যানভূমি, বৃক্ষশীর্ষ —
চন্দ্রালোকে মনোহর।
গঙ্গা জ্যোৎস্নাময়ী—
মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরবাহিনী!
নিজের ঘরের ছোট খাটটিতে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ,
নিঃশব্দে চিন্তা করিতেছেন
জগন্মাতার।   (৯৭৫)

বাহিরে চাঁদ।
জগৎ নিঃশব্দে হাসিতেছে।
ঘরে সকলে নিস্তব্ধ।
তাঁহারা ঠাকুরের শান্ত মূর্তি দেখিতেছেন।
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। (৭৪)

অনেক রাত্রি, অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা,
আকাশ, গঙ্গা, কালীবাড়ি, মন্দিরশীর্ষ, উদ্যানপথ, পঞ্চবটী,
ভাসিতেছে চাঁদের আলোয়।
মণি একাকী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করিতেছেন।
রাত্রি তিনটা হইল, তিনি উঠিলেন, পঞ্চবটীর ঘরে যাইবেন।
চতুর্দিক নীরব, এগারোটার সময়ে জোয়ার আসিয়াছে,
এক-একবার জলের শব্দ শুনা যাইতেছে।
পঞ্চবটীর পথে মণি দূর হইতে শুনিতে পাইলেন,
কে যেন পঞ্চবটীর ভিতর হইতে আর্তনাদ করিয়া ডাকিতেছে,
'কোথায় দাদা মধুসূদন ?'
বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্য হইতে চাঁদের আলো ফাটিয়া পড়িতেছে।
মণি আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,
পঞ্চবটীমধ্যে ঠাকুরের একটি ভক্ত,
নির্জনে—তিনিই একাকী ডাকিতেছেন—
'কোথায় দাদা মধুসূদন ?'
মণি নিঃশব্দে দেখিতেছেন। (২৮৪)

নিবিড় আঁধারে চমকে

অমাবস্যা।
নিবিড় আঁধারমধ্যে মহাকালী,
মহাকালের সঙ্গে রমণ।
ঠাকুর তাই অমাবস্যায় স্থির থাকিতে পারেন না। (২২৭)

কালীপূজার রাত্রি।
ভক্তেরা কেহ-কেহ কালীমন্দিরে গেলেন ঠাকুর দর্শনে।
কেহ-বা দর্শন করিয়া একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া—
জপ করিতেছেন নিঃশব্দে।
রাত্রি প্রায় এগারোটা। মহানিশা।

জোয়ারের জল সবে আসিয়াছে,
তীরস্থ দীপালোকে কালো জল এক-একবার দেখা যাইতেছে।

রামলাল পূজাপদ্ধতি-পুঁথিহস্তে মায়ের মন্দিরে আসিলেন।
মণি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতেছেন।
মার সম্মুখে দুই সেজ, উপরে ঝাড়, ঘর আলোকাকীর্ণ।
মন্দিরতল নৈবেদ্যে পরিপূর্ণ।
বেশকারী নানাবিধ পুষ্পমালায় মাকে সাজাইয়াছেন,
মার পাদপদ্মে জবা বিল্ব, সম্মুখে চামর ঝুলিতেছে।
মণির হঠাৎ মনে পড়িল—
ঠাকুর এই চামর লইয়া মাকে কত ব্যজন করেন।

মহানিশা।
পূজা আরম্ভ হইয়াছে।
ঠাকুর আসিয়াছেন, মার কাছে গিয়া দর্শন করিতেছেন।
এইবার বলি আরম্ভ হইবে,
লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে।
বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল,
বলিদানের জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে।
ঠাকুর মন্দির ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।
তিনি পশুবধ দেখিতে পারিবেন না,
তাঁহার সে অবস্থা নয়। (৩৫৫)

শ্যামপুকুর বাটী। শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫,
শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি সাতটা।
উপরের ঘরে পূজার আয়োজন,
নানাবিধ পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা, সেইসঙ্গে মিষ্টান্ন ও পায়স।
ঠাকুর বসিয়া আছেন, চতুর্দিক ঘিরিয়া ভক্তগণ।
ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন।

দেখিতে-দেখিতে ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন গিরিশ।
মাস্টার দিলেন গন্ধপুষ্প,
রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ফুল দিতে লাগিলেন চরণে।
পায়ে ফুল দিয়া, 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলিয়া,
পায়ে মাথা রাখিয়া, প্রণাম করিতেছেন নিরঞ্জন।
ভক্তেরা ধ্বনি তুলিতেছেন—জয় মা! জয় মা!

ঠাকুর সমাধিস্থ।
জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল, দুই হস্তে বরাভয়।
উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন।

গিরিশ স্তব করিতেছেন—
কে রে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল চরণযুগল হর-উরসে বিরাজে ॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ।
মৃদু মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে ॥
বিহারী স্তব করিতেছেন—
মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোনো মা বলি,
হৃদয়মাঝে উদয় হয়ো মা যখন হবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তিচন্দন মা পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।
মণি ভক্তসঙ্গে গাহিতেছেন—
সকলি তোমারি ইচ্ছা মা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। (৬০১-৬০২)

আনন্দ উতরোল

ঐ দ্যাখো, ঠাকুরের বহির্জগতের হুঁশ চলিয়া গেল।
দেখিতে দেখিতে আরও ভাবান্তর।
এই আবার নরেন্দ্রের কাছে হাত জোড় করিয়া কি বলিতেছেন!
কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক।
তারপর মাতোয়ারা—
'দেখিস রাই, যমুনায় যে পড়ে যাবি, কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী।'
আবার ভাবে বিভোর—
'সখি, সে বন কতদূর, যে-বনে আমার শ্যামসুন্দর।
ঐ যে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যায়, আমি চলিতে যে নারি।'
এখন জগৎ ভুল, কাহাকেও মনে নাই,
নরেন্দ্র সম্মুখে, নরেন্দ্রকে মনে নাই।
'গোরা-প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা'—
এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান।
বসিয়া বলিতেছেন—
'ঐ একটা আলো আসছে, দেখতে পাচ্ছি,
কোন্ দিক দিয়ে পারছি না বুঝতে।'

নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—
'সব দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে, মো'হিলে প্রাণ···।
শুনিতে-শুনিতে ভুল হইয়া গেল বহির্জগৎ।
সমাধিভঙ্গের পরে বলিতেছেন—
'আমারে কে লয়ে যাবে!'
বালক যেমন সঙ্গী না দেখিলে অন্ধকার দ্যাখে—
সেইরূপ। (১৬৩-৬৪)

ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে প্রেমের উৎস উচ্ছ্বসিত।
রাত প্রায় আটটা।
প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর বারন্দায় বিচরণ করিতেছেন, একাকী,
দ্রুতপদে এক সীমা হইতে অন্য সীমা।
মাঝে-মাঝে মার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন।
হঠাৎ বলিযা উঠিলেন উন্মত্তের মতো—
'তুই আমাব কি করবি?' (২১০)

মাথুর গান।
কীর্তনীযা গাহিতেছেন গৌরচন্দ্রিকা।
কৃষ্ণপ্রেমে পাগল গৌরাঙ্গ, সন্ন্যাস করিয়াছেন,
অদর্শনে কাতর নবদ্বীপেব ভক্তরা কাঁদিতেছেন—
'গৌর একবার চলো নদীয়ায়।'
এবার শ্রীমতীর বিরহের গান।
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, হঠাৎ দণ্ডায়মান।
অতি করুণস্বরে আখর দিতেছেন—
'সখি, প্রাণবল্লভকে নিয়ে আয় আমাব কাছে,
নয় সেখানে রেখে আয় আমাকে।'
বলিতে-বলিতে নির্বাক,
দেহ স্পন্দহীন, নেত্র অর্ধনিমীলিত।
অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ।
আবার সেই করুণ স্বর—
'সখি, তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে!
আমি দাসী হব তোর, তুই শিখিয়েছিস কৃষ্ণপ্রেম।
প্রাণবল্লভ! প্রাণবল্লভ!'

গান চলিতেছে—
'সখি, যমুনায় জল আনতে যাব না,

কদমতলায় দেখেছি প্রিয়সখাকে,
সেখানে গেলে বিহ্বল হয়ে যাই !

গান চলিতেছে—
'শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গসুখ লালসে।'
'ভূষণের ভূষণ গেছে, আর ভূষণে কাজ নাই'গো !'

গান চলিতেছে—
'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।'

গান চলিতেছে—
'ধনী ভেল মুরছিত হরল গেয়ান,
তখনি তো প্রাণসখী মুদিল নয়ান।'

গান চলিতেছে—
'শ্যাম নামে প্রাণ পেয়ে ইতি-উতি চায়
না দেখি সে চাঁদমুখ কাঁদে উভরায়।'

গান চলিতেছে—
'হা হা নাগর, গোপীজনজীবন,
দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ রাখো।
কোথায় আছো হে হৃদয়বল্লভ হরি,
দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখো।'

শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ।
কীর্তনীয়ারা তাঁহাকে ঘেরিয়া উচ্চস্বরে কীর্তন করিতেছেন।
ভাব ভঙ্গে আখর দিতেছেন ঠাকুর—
'ধনী দাঁড়ালো রে !
অঙ্গ হেলাইয়ে ধনী দাঁড়ালো রে !
তমাল বেড়ি ধনী দাঁড়ালো রে।'
খোল করতাল সঙ্গে কীর্তনীয়ারা গাহিতেছে—
'রাধে গোবিন্দ জয় !'
ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন।
ভক্তরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নাচিতেছেন আনন্দে।
'রাধে গোবিন্দ জয় ! রাধে গোবিন্দ জয় !' (১৪+১৬)

বড়বাজার দিয়া গাড়ি চলিতেছে।
দেওয়ালির ভারী ধূম।
রাত্রি অন্ধকার, কিন্তু আলোয় আলোময়।
বড়বাজারের গলি হইতে গাড়ি পড়িল চিৎপুর রোডে।
সে স্থানেও আলোবৃষ্টি, পিপীলিকার ন্যায় লোকাকীর্ণ।
লোকে হাঁ করিয়া দুইপার্শ্বের সুসজ্জিত বিপণিশ্রেণী দেখিতেছে।
কোথাও মিষ্টান্নের, কোথাও-বা আতর-গোলাপের দোকান,
সুন্দর চিত্রশোভিত।
দোকানদারগণ মনোহর বেশ পরিয়া গোলাপপাশ হস্তে ধরিয়া,
দর্শকদের উপর বর্ষণ করিতেছে গোলাপজল।
গাড়ি একটি আতর-দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল।
ছবি ও রোশনাই দেখিয়া বালকের ন্যায় ঠাকুর আহ্লাদিত।
চতুর্দিকে কোলাহল।
ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—
আরও এগিয়ে, আরও এগিয়ে।
বলিতে-বলিতে হাসিতেছেন। (৩৬০)

ঠাকুর বোসপাড়ার তেমাথা পার হইতেছেন,
কিছুদূরেই গিরিশের বাড়ি।
এত শীঘ্র চলিতেছেন কেন ?
না জানি হৃদয়মধ্যে কোন্ অদ্ভুত দেবভাব উপস্থিত !
বেদে যাঁহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন,
তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি পাগলের মতো পদবিক্ষেপ ?
এই-যে নরেন্দ্র আসিতেছেন।
নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া উনি পাগল।
কিন্তু কই, নরেন্দ্র সম্মুখে আসিলেন,
ঠাকুর তো কথা কহিতেছেন না।
কে এই ভাব বুঝিবে !
গিরিশের বাড়ির গলির সম্মুখে ঠাকুর উপস্থিত,
সঙ্গে ভক্তগণ।
এইবার নরেন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন—
'ভালো আছো বাবা ?

আমি তখন কথা কইতে পারি নাই।'
কথার প্রতি অক্ষর করুণামাখা।
নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন -
একটা কথা—এই একটি—ও একটি।
ভাবে কী দেখিতেছিলেন—তিনিই জানেন।
দু'একটি কথা উচ্চারিত হইল.
যেন দৈববাণী !
যে-অনন্ত সমুদ্রতীরে গিয়াছি.
যেন সেই তরঙ্গ-উত্থিত অনাহত শব্দের
একটি-দুটি ধ্বনি ! (১৫০-৫৮)

রূপের অতীত তীরে

উত্তরপশ্চিমে সুন্দর মেঘ।
ঝাউতলা হইতে ঠাকুর দক্ষিণাস্য আসিতেছেন।
পশ্চাতে নবীন মেঘ--
গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত।
গঙ্গার জল কৃষ্ণবর্ণ।
ঠাকুর আসিতেছেন !
যেন সাক্ষাৎ ভগবান, দেহধারণ করিয়াছেন ভক্তের জন্য,
হরিপদসম্ভূতা কলুষনাশিনী সুরধুনীর তীরে
সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত।
তাই কি সেবকগণ, দৌবারিকগণ.
দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা,
বৃক্ষ লতা, গুল্ম, উদ্যানপথ. প্রত্যেক ধূলিকণা—
এত মধুর ! (৭১৯)

ঠাকুর সমাধিস্থ, দাঁড়াইয়া, গলায় মালা।
পাছে পড়িয়া যান, এক ভক্ত ধরিয়া আছেন।
ভক্তেরা কীর্তন করিতেছেন, খোল করতাল।
ঠাকুরের দৃষ্টি স্থির, বদন প্রেমরঞ্জিত।
ভক্তেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন আনন্দমূর্তি।
সমাধিভঙ্গ হইল। বেলা হইয়াছে।
কিয়ৎক্ষণ পরে কীর্তন থামিল।
নববস্ত্র পরিয়া ঠাকুর বসিলেন ছোট খাটটিতে।

পীতাম্বরধারী আনন্দময় পুরুষ, জ্যোতির্ময়,
ভক্ত-চিত্তবিনোদন, দেবদুর্লভ, অপরূপ।
দেখিয়া-দেখিয়া নয়নের তৃপ্তি হয় না,
ইচ্ছা হয়, আরও দেখি,
মগ্ন হই রূপসাগরে। (২২১)

গঙ্গাবক্ষে অনেক দূরে নৌকা,
মাঝি গান ধরিয়াছে।
অনাহত ধ্বনির ন্যায় মধুর গীতধ্বনি—
অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়া,
গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষকে স্পর্শ করিয়া,
প্রবেশ করিল ঠাকুরের কর্ণকুহরে।
ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট,
সমস্ত শরীর কণ্টকিত।
'পুলকে পূরিত অঙ্গ।' (৯১১-১২)

রাত হইয়াছে, মাস্টার বিদায় গ্রহণ করিবেন,
কিন্তু যাইতে পারিতেছেন না,
তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে আসিয়া
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন।
খুঁজিতে-খুঁজিতে দেখিলেন –
মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে, নাটমন্দিরে,
ঠাকুর একাকী পাদচারণ করিতেছেন।
মন্দিরে মা'র দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছে,
বৃহৎ নাটমন্দিরে কেবল একটি আলো,
ক্ষীণ আলোক,
আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়
নাটমন্দিরে সেইরূপ।
সেই ক্ষীণালোকমধ্যে ঠাকুর একাকী পাদচারণ করিতেছেন,
একাকী, নিঃসঙ্গ।
পশুরাজ যেন অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, আপন মনে,
আত্মারাম, অনপেক্ষ। (২৯-৩০)

বাউল এল গেল

ঠাকুরের শরীরে অশ্রুতপূর্ব যন্ত্রণা।

ভক্তেরা দেখেন, বিদীর্ণ হয় হৃদয়।
ঠাকুর কিন্তু ভুলাইয়া রাখিয়াছেন সকলকে।
বসিয়া আছেন—সহাস্য বদন।

ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়াছেন।
ঠাকুর ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন,
কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে।
ঠাকুরের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ,
বুঝি পূজা করিতেছেন তাঁহারই।
কিংবা ফুল লইয়া খেলা করিতেছে একটি বালক।

ঠাকুরের শরীরে যখন ঈশ্বরীয় ভাব হয়—
তখন বলেন, শরীরে মহাবায়ু ঊর্ধ্বগামী।
মহাবায়ু উঠিলে—ঈশ্বরের অনুভূতি।
মাস্টারকে বলিতেছেন, কি দেখছি জানো—
শরীরটা যেন বাঁখারী-সাজানো কাপড়মোড়া কিছু,
নড়ছে সেইটা,
ভিতরে একজন আছেন—নড়ছে তাই।
একটা খোল আশ্রয় ক'রে অন্তরে বাহিরে—
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।
তোমাদের সব আত্মীয় দেখছি, কেউ পর নয়,
দেখছি, সবাই মাথা নাড়ছে এক-একটা খোল নিয়ে।
দেখছি, একটা চামড়া-ঢাকা অখণ্ড—
একপাশে পড়ে আছে গলার ঘা। (৪০৫)

আজ রবিবার, ১৪ মার্চ, ৮৮৬। কাশীপুর উদ্যানবাটী।
ঠাকুর বিশেষ অসুস্থ।
রাত্রি দুই প্রহর, শুক্লপক্ষের নবমী তিথি,
চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি প্লাবিত।
ঠাকুরের কঠিন পীড়া,
তাই চন্দ্রদর্শনে ভক্তহৃদয়ে আনন্দ নাই।
যেন সুন্দর নগরী, কিন্তু অবরোধ করিয়াছে শত্রুসৈন্য।
চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কেবল বৃক্ষপত্রে শব্দ।
উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন,
নিদ্রা নাই।
দু'একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া,

কখন কি দরকার হয়।

ঠাকুর ইঙ্গিতে মাস্টারকে কাছে আসিতে বলিতেছেন।
তাঁহার কষ্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়।
অতি কষ্টে মাস্টারকে আস্তে-আস্তে বলিতেছেন
তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি,
সবাই যদি বলো—যখন এত কষ্ট, তবে দেহ যাক
তাহলে দেহ যায়।
কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ।
কেহ ভাবিতেছেন— এরই নাম ক্রুশিফিকশন
ভক্তদের জন্য দেহ বিসর্জন।

পরদিন সকালবেলা।
ভক্তদের মুখে কথা নাই।
পূর্বরাত্রির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা বিষাদগম্ভীর।

ঠাকুর বলিতেছেন—
কি দেখছি জানো, তিনি সব হয়েছেন।
মানুষ, জীব, যা দেখছি,
ভিতর থেকে হাত-পা নাড়ছেন তিনিই।
একবার দেখেছিলাম—
বাড়ি, বাগান, রাস্তা, গরু, মানুষ,
সব মোমের তৈরী—তৈরী এক জিনিসে।
দেখছি—যে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাঠ।

আবার ভাবাবস্থা।
একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন
এখন আমার কোনো কষ্ট নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা।
লাটুর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন
ঐ লেটো—মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে
যেন মাথায় হাত দিয়ে রয়েছেন -ঈশ্বরই।

ঠাকুর ভক্তদের দেখিতেছেন, স্নেহে বিগলিত।
শিশুকে যেমন আদর করে সেইভাবে মুখে হাত বুলাইয়া
নরেন্দ্র ও রাখালকে আদর করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মাস্টারকে বলিতেছেন—
শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকদের চৈতন্য হত।
খানিক চুপ। তারপর বলিলেন—
তা রাখবে না।
সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে।

ভক্তরা স্তব্ধ।
ঠাকুর হাত রাখিলেন নিজের হৃদয়ে।
নরেন্দ্রাদিকে বলিতেছেন-
এর ভিতর দুটি আছে—
একটি তিনি, আর একটি ভক্ত।
ভক্তেরই হাত ভেঙেছিল, অসুখ করেছিল তারই।
ভক্তরা চুপ।
ঠাকুর বলিতেছেন—
কাকেই বা বলব, কেই-বা বুঝবে!
কিয়ৎক্ষণ পরে—
তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, আসেন ভক্তদের সঙ্গে,
ভক্তরা আবার চলে যায় তাঁরই সঙ্গে।
ঠাকুর মৃদুমৃদু হাসিতেছেন,
বলিলেন—
বাউলের দল হঠাৎ এলো, নাচলে, গাইলে,
আবার চলে গেল।
এলো—গেল—কেউ চিনলে না। (৬০৭-১০)

নানা সঙ্গে রামকৃষ্ণ

কেশবচন্দ্র সেন

কেশব জাহাজ আনিয়াছেন, ঠাকুর জাহাজে উঠিবেন।
জাহাজ ভাসিতেছে।
জাহাজের পূর্ব দিকে বাঁধাঘাট ও ঠাকুরবাড়ির চাঁদনি,
চাঁদনির উত্তরে ছয় শিবমন্দির, বামেও তাই।
শরতের নীল আকাশের চিত্রপট,
তাহার উপরে ভবতারিণীর মন্দিরচূড়া, পঞ্চবটী, ঝাউশীর্ষ।
বকুলতলার নিকটে ও কালীবাড়ির দক্ষিণপ্রান্তে দুই নহবৎখানা,
মধ্যে উদ্যানপথ, সারি-সারি পুষ্পবৃক্ষ,
জাহ্নবীজলে প্রতিভাসিত নীল আকাশ,
বহির্জগতে কোমলতা, কোমলতা ব্রাহ্ম-ভক্তহৃদয়ে।
সম্মুখে সুন্দর দেবালয়, নিম্নে পবিত্রসলিলা গঙ্গা,
আসিতেছেন মহাপুরুষ,
সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম,
কোন্ পাষাণহৃদয় না বিগলিত হইবে!

ঠাকুর নৌকা করিয়া জাহাজে উঠিতেছেন,
নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য।
নৌকা জাহাজে আসিয়া লাগিল।
সকলেই ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত।
অতি কষ্টে হুঁশ করাইয়া জাহাজের ভিতর লওয়া হইল।
কেশবাদি ভক্তগণ প্রণাম করিলেন।
আবার সমাধিস্থ।
সমাধিভঙ্গে অস্ফুটে বলিতেছেন--
মা, আমায় এখানে আনলি কেন?
আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব?

ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়াছে, বলিতেছেন—

তিনি সর্বভূতে আছেন,
ভক্তহৃদয়ে আছেন বিশেষ রূপে।
জমিদার তাঁর জমিদারীর সকল স্থানেই থাকতে পারেন,
তবে প্রায়ই থাকেন বিশেষ এক বৈঠকখানায়!
ভক্তহৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

জাহাজ দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইল।
চিত্রপট হইতে সরিয়া গেল সুন্দর দেবালয়ের ছবি।
পোতচক্রক্ষুব্ধ নীলাভ গঙ্গাবারি,
তরঙ্গায়িত, ফেনিল, কল্লোলপূর্ণ।
সে কল্লোল ভক্তকর্ণে পৌঁছিতেছে না।
মুগ্ধ তাঁহারা দেখিতেছেন অদ্ভুত এক যোগী।
সহাস্যবদন, আনন্দময়, প্রেমরঞ্জিতনয়ন, প্রিয়দর্শন,
ঈশ্বর বই জানেন না কিছুই।

ঠাকুর বলিতেছেন--
ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ,
যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, সূর্য ও তার রশ্মি।
আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন—
তাঁরই নাম কালী।

ঠাকুর বলিতেছেন—
মন নিয়েই সব, মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত।
আমি মুক্তপুরুষ,
সংসারে থাকি বা অরণ্যে, আমার বন্ধন কি ?
আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে,
আমায় বাঁধে কে ?

ঠাকুর বলিতেছেন—
ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস থাকা চাই—
কী! আমি তাঁর নাম করেছি, এখনো পাপ ?
আমার আবার পাপ কি ?
কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ,
বৃন্দাবনে গিছিল,
ভ্রমণ করতে-করতে একদিন তৃষ্ণার্ত,
কুয়োর ধারে গিয়ে বলল একজনকে,

'ওরে তুই এক ঘটি জল দিতে পারিস ?
সে বললে, 'ঠাকুরমশাই, আমি হীন মুচি।'
কৃষ্ণকিশোর বললে, 'বল তুই শিব।
নে, এখন জল দে।'

অগ্নেয়পোত কলিকাতার দিকে দ্রুত চলিতেছে।
জাহাজ কতদূর গিয়াছিল অনেকের জ্ঞান নাই।
তাঁহারা মগ্ন হইয়া শুনিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।
মুড়ি নারিকেল খাওয়া হইতেছে.
সকলেই কিছু-কিছু কোঁচড়ে লইয়াছেন,
আনন্দের হাট।
ঠাকুর দেখিলেন, বিজয় ও কেশব সংকুচিত।
কেশবকে ত্যাগ করিয়া বিজয় সাধারণ সমাজভুক্ত হইয়াছেন.
কেশবের কন্যা বিবাহ-ব্যাপারে বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন.
তাই অপ্রস্তুত।
ঠাকুর যেন দুই অবোধ ছেলেকে ভাব করাইবেন।
কেশবকে বলিলেন—
ওগো, এই বিজয় এসেছেন।
তোমাদের ঝগড়া বিবাদ যেন শিব ও রামের যুদ্ধ।
রামের গুরু শিব, তাঁদের যুদ্ধও হল. ভাবও হল,
কিন্তু শিবের ভূত আর রামের বানরের ঝগড়া কিচিমিচি মেটে না।
আপনার লোকের মধ্যে এরূপ বিবাদ হয়েই থাকে।
লব কুশ রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।
আবার জানো. মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে,
তেমনি তোমাদের।
এর একটি সমাজ আছে. ওর একটি দরকার।
এসব চাই।
যদি বলে, ভগবান নিজে লীলা করছেন,
সেখানে জটিলে-কুটিলের কী দরকার ?
দরকার আছে।
জটিলে-কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না.
লীলা পোস্টাই হয় না।

ঠাকুর বলিতেছেন—
দ্যাখো, মানুষ দেখতে সব একরকম,
কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি।

কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ, কারু তমোগুণ
পুলিগুলি দেখতে সব একরকম,
কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু নারিকেলের ছাঁই,
কারু বা কলায়ের পোর।

কলকাতার হুজুগ তো জানো !
শুধু লেকচার।
যতক্ষণ কাঠে জ্বাল—দুধ ফোলে ফোঁস ক'রে,
কাঠ টেনে নিলে পূর্ববৎ।
কলকাতার সব হুজুগে লোক।
কুয়ো খুঁড়ছে—জল চাই,
পাথর পেলে তো ছেড়ে দিলে,
আবার খুঁড়তে লাগল এক জায়গায়,
সেখানে বালি হল তো দিলে ছেড়ে।
শুধু লেকচার।
লোকশিক্ষা দেবে ? তার চাপরাশ চাই।
না হলে হয়ে পড়ে হাসির কথা।
আপনারই হয় না—আবার অন্য লোক।
কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে—কানা।
গুরু হতে চায় সকলেই।
কে চায় শিষ্য হতে ?

জাহাজ ফিরিয়া আসিল।
ঘরের বাহিরে কোজাগরের পূর্ণচন্দ্র।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য গাড়ি আনিতে দেওয়া হইল।
গাড়িতে সকলে বসিলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—
'তিনি কই ? কেশব কই ?'
কেশব আসিয়া উপস্থিত, মুখে হাসি,
ভূমিষ্ঠ হইয়া পদধূলি লইলেন ঠাকুরের।
গাড়ি চলিতে লাগিল।
ইংরাজটোলা।
সুন্দর রাজপথ, পথের দুইধারে সুন্দর-সুন্দর অট্টালিকা,
বিমল শীতল চন্দ্রকিরণে যেন বিশ্রাম করিতেছে,
দ্বারদেশে বাষ্পীয় দীপ, কক্ষমধ্যে দীপমালা,
স্থানে-স্থানে হারমোনিয়াম ও পিয়ানো সংযোগে
গান করিতেছে ইংরাজ মহিলারা।

ঠাকুর হাস্য করিতে-করিতে আনন্দে যাইতেছেন। (৩১-৪৩)

ঠাকুর পূর্বকথা বলিতেছেন—
কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম।
বলেছিলুম, এর লেজ খসেছে।
হেসে উঠল সবাই।
কেশব বললে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে,
জিজ্ঞাসা করি এঁকে।
আমি বললুম, যতদিন বেঙাচির লেজ না খসে
ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়,
আড়ায় উঠে বেড়াতে পারে না ডাঙায়।
যেই লেজ খসেছে অমনি ডাঙায় লাফ দিয়ে ওঠে।
তখন জলেও থাকে, ডাঙাতেও।
তেমনি যতদিন না মানুষের খসে অবিদ্যার লেজ
ততদিন পড়ে থাকে সংসার-জলে।
অবিদ্যার লেজ খসলে বেড়াতে পারে মুক্ত হয়ে,
আবার ইচ্ছা হলে থাকতে পারে সংসারেও। (১৪০)

কেশব সেন উপাসনা করছিল।
বলে—হে ঈশ্বর, যেন ডুবে যাই তোমার ভক্তিনদীতে।
শেষ হয়ে গেলে আমি বললুম কেশবকে,
ওগো, যদি তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে একেবারে—
তাহলে চিকের আড়ালে যাঁরা তাঁদের কী হবে ?
ডুব দেবে দাও,
তবে তলিয়ে যেও না,
মাঝে মাঝে আড়ায় উঠো। (৮৩৩, ৩১২)

সন্ধ্যার পরে ঘাটে বসে কেশব উপাসনা করলে।
উপাসনার পরে বললুম কেশবকে,
দ্যাখো, ভগবানই একরূপে ভাগবত ;
তাই বেদ, তন্ত্র, পুরাণ—পূজা করতে হয় এইসব।
আবার একরূপে তিনি ভক্ত,
ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা,
তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা।
কেশব আর তার লোকেরা শুনলে মন দিয়ে।
তখন পূর্ণিমা, চারিদিকে চাঁদের আলো,

গঙ্গাকূলে সিঁড়ির চাতালে সব বসে,
আমি বললুম, বলো সকলে—
ভাগবত—ভক্ত—ভগবান।
সকলে বললে একসুরে—'ভাগবত ভক্ত ভগবান।'
আমি বললুম, এবার বলো—
ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।
তারা বললে—'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।'
বললুম, তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো, আমি তাঁকেই বলি মা,
মা বড় মধুর নাম।
তারপর যখন বললুম, বলো—
গুরু—কৃষ্ণ—বৈষ্ণব।
তখন কেশব বললে—মহাশয় অতদূর নয়,
তাহলে লোকে আমাদের বলবে গোঁড়া বৈষ্ণব। (৯৬৫)

কেশবের পীড়া,
অনেকে বলিতেছেন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।
শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভালবাসেন।
তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন।
বেলা পাঁচটা, কমলকুটীরে ঠাকুরের গাড়ি আসিয়া উপস্থিত।
বাড়ির লোকেরা ঠাকুরকে উপরে লইয়া গেলেন।
বৈঠকখানায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তাঁহাকে বসানো হইল।
ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন,
কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য।
কেশবের শিষ্যরা বিনীতভাবে বলিতেছেন :
তিনি এই একটু বিশ্রাম করছেন, আসবেন একটু পরেই।
কেশবের সংকটাপন্ন পীড়া, তাই এত সাবধান।
ঠাকুর উত্তরোত্তর ব্যস্ত,
তাঁকে ভুলাইবার জন্য প্রসন্ন কেশবের গল্প করিতেছেন।
প্রসন্ন বলিলেন, তাঁর অবস্থা এখন আর একরকম,
আপনারই মতো কথা কন মার সঙ্গে,
মা কি বলেন শুনে হাসেন কাঁদেন।
শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, দেখিতে-দেখিতে সমাধিস্থ।
সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ।
অনেক কষ্টে তাঁহাকে পাশের বৈঠকখানায় লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেক আসবাব, কৌচ কেদারা আলনা, গ্যাসের আলো।
কৌচে বসিয়া ঠাকুর আবার বাহ্যশূন্য,
মহাভাবের নেশা চলিতেছে।
ঘর আলোকময় ; ব্রাহ্মভক্তরা বসিয়া আছেন চতুর্দিকে।
ভাবাবস্থায় ঠাকুর আপনা-আপনি বলিতেছেন—
দেহ হয়েছে, আবার যাবে ; আত্মার মৃত্যু নাই।
যেমন সুপারি, কাঁচাবেলায় ফল আর ছাল আলাদা করা শক্ত ;
পাকা সুপারি সহজেই ছাল থেকে আলাদা হয়।
তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহবুদ্ধি যায় ;
তখন বোধ হয়—দেহ ও আত্মা আলাদা।

কেশব এইবার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।
যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মমন্দিরে বা টাউনহলে দেখিয়াছেন
তাঁহারা এই অস্থিচর্মসার মূর্তি দেখিয়া অবাক।
কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, দেওয়াল ধরিয়া আসিতেছেন।
অনেক কষ্টে কৌচের সম্মুখে আসিলেন।
ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নীচে নামিয়া বসিয়াছেন।
কেশব ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন, অনেকক্ষণ।
ঠাকুরের এখনো ভাবাবস্থা, আপনা-আপনি কি বলিতেছেন।
কেশব উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আমি এসেছি, আমি এসেছি।
ঠাকুরের বাম হাত ধরিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।
ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা, কত কথা বলিতেছেন আপনমনে।
ঠাকুর বলিতেছেন—
যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণ নানা বোধ,
যেমন প্রসন্ন, কেশব, অমৃত।
পূর্ণজ্ঞান হলে এক-চৈতন্য।
তবে শক্তিবিশেষ। তিনি সব হয়েছেন, ঠিকই,
কিন্তু কোনোখানে বেশি শক্তির বিকাশ, কোনোখানে কম।
যে আধারে লীলার প্রকাশ—সেখানে বিশেষ শক্তি।
মানুষে বেশি প্রকাশ,
সত্ত্বগুণী ভক্তের মধ্যে আরও বেশি।
যার আছে অন্ধকার জ্ঞান, তার আছে আলোর জ্ঞান,
যার আছে রাত জ্ঞান, তার আছে দিন জ্ঞান,
তার আছে সুখ জ্ঞান, তার আছে দুঃখ জ্ঞান।

কথা কহিতে-কহিতে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ।

একঘর লোক উৎকর্ণ।
সকলে অবাক—
'তুমি কেমন আছো' ইত্যাদি আদৌ নয়।
কেবল ঈশ্বরের কথা।
ঠাকুর বলিতেছেন—
কি জানো, মানুষ নিজে আদর করে ঐশ্বর্যের,
তাই ভাবে তাই করেন ঈশ্বরও।
ভাবে, তাঁর ঐশ্বর্যের প্রশংসা করলে খুশি হবেন।
শম্ভু বলেছিল, এখন এই আশীর্বাদ করো,
যাতে এই ঐশ্বর্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি।
আমি বললুম, তোমার পক্ষে ঐশ্বর্য, তাঁর কাছে কি!
ঈশ্বর কি ঐশ্বর্যের বশ ?—না।
তিনি ভক্তির বশ।
তিনি কি টাকা চান ?—না।
তিনি চান, ভাব ভক্তি প্রেম বিবেক বৈরাগ্য।
ঠাকুর কেশবকে বলিলেন—
তোমার অসুখের মানে আছে।
শরীরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে অনেক ভাব।
তাই এই অবস্থা।
ভাব যখন হয় বোঝা যায় না।
কিন্তু অনেক-অনেক পরে আঘাত লাগে শরীরে।
বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে চলে গেলে
তখনি টের পাওয়া যায় না কিছু,
খানিক পরে কিনারার উপর জল ধপাস্-ধপাস্, তোলপাড়,
হয়ত কিনারা খানিক ভেঙে পড়ল জলে।
কুঁড়েঘরে হাতি প্রবেশ করলে ঘর চুরমার।
ভাবহস্তী প্রবেশ করলে দেহঘরে—
দেহ তোলপাড়।
হৃদু বলত, এমন ভাব দেখি নাই, এমন রোগ দেখি নাই।
তখন আমার খুব অসুখ, দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে মাথায়,
কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাত্রিদিন।
নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এসে দ্যাখে, আমি বিচার করছি।
সে বলল, একি পাগল, দুখানা হাড় নিয়ে বিচার!
ঠাকুর এবার বলিতেছেন—
কেশব, তোমার অসুখ হলে বড় ব্যাকুল হয় প্রাণ।
আগের বার তোমার অসুখের সময়ে কাঁদতুম রাত্রির শেষ প্রহরে,

বলতুম, মা, কেশবের কিছু হলে কথা কব কার সঙ্গে ?
এবার অত হয় নাই।

দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।
দ্বারদেশ হইতে উমানাথ-ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,
মা প্রণাম করছেন আপনাকে।
ঠাকুর হাসিতেছেন। উমানাথ বলিলেন,
মা বলছেন, কেশবের অসুখটি যেন সারে।
ঠাকুর বলিতেছেন—
মা আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনি দুঃখ দূর করবেন।
উমানাথ আবার বলিতেছেন—
মা বলছেন, আশীর্বাদ করুন কেশবকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—
আমার কি সাধ্য ! আশীর্বাদ করবেন—তিনি।
'তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'
ঈশ্বর দুইবার হাসেন।
একবার হাসেন যখন দেখেন—
জমি বখরার সময় দুই ভাই দড়ি মাপে আর বলে,
এ-দিকটা আমার, ও-দিকটা তোমার।
ঈশ্বর হাসেন এই ভেবে,
জগৎ আমার,
অথচ তার খানিকটা মাটি নিয়ে বলছে এরা,
এ-দিকটা আমার, ও-দিকটা তোমার !
ঈশ্বর আর একবার হাসেন যখন দেখেন—
ছেলের সংকট পীড়া, মা কাঁদছে,
বৈদ্য বলেছে, ভয় কি মা, আমি ভালো ক'রে দেব।
বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করে।
সকলে স্তব্ধ।

ঠিক এই সময়ে কেশবের কাশি শুরু হইল।
কাশি থামিতেছে না, দেখিয়া সকলের বড় কষ্ট।
কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না।
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ঠাকুরকে।
তারপর অনেক কষ্টে দেওয়াল ধরিয়া,
যে-দ্বার দিয়া আসিয়াছিলেন,
প্রস্থান করিলেন সেই দ্বার দিয়া। (২৬৪-৭১)

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

পশ্চিমে অনেক তীর্থভ্রমণের পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সবে পৌঁছিয়াছেন কলিকাতায়।
পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।
বিজয় বলিলেন, মিছে ঘোরা,
এখন যেখানে বসে আছি এখানেই সব।
কোনো জায়গায় এরই এক আনা কি দুই আনা,
কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত :
এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা।
বিজয় আবার বলিলেন,
ধরা না দিলে ধরা শক্ত।
তবে বুঝেছি আপনি কে ?
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ। বলিলেন—
যদি তা হয়ে থাকে তো তাই।
নরেন্দ্র তানপুরা-সঙ্গে গাইতেছেন—
'সুন্দর তোমার নাম, দীনশরণ হে
'আমায় দে মা পাগল ক'রে···'
গানের পর অদ্ভুত দৃশ্য, ভাবে উন্মত্ত সকলেই।
পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন পণ্ডিত—
'দে মা পাগল ক'রে, কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'
বিজয় সর্বপ্রথম উঠিয়াছেন, ভাবোন্মত্ত।
তাঁহার পরে রামকৃষ্ণ—ভুলিয়াছেন দেহের অসাধ্য ব্যাধি।
ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও দাঁড়াইয়াছেন।
রোগীর হুঁশ নাই, ডাক্তারেরও নাই।
ছোট নরেন ও লাটুর ভাবসমাধি।
ভাব উপশম হইলে কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ হাসিতেছেন।
যেন একত্র হইয়াছে কতকগুলি মাতাল। (১৮৫)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, ৫ অগস্ট, ১৮৮২।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ি আসিয়াছেন।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া প্রথম কামরাটিতে প্রবেশ করিলেন ভক্তসঙ্গে।
বিদ্যাসাগর সেখানে দু'একটি বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন,
অভ্যর্থনা করিলেন দণ্ডায়মান হইয়া।
ঠাকুর পশ্চিমাস্য,
টেবিলের পূর্বপার্শ্বে দাঁড়াইয়া—বামহস্ত টেবিলের উপর।
পূর্বপরিচিতের ন্যায় বিদ্যাসাগরকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন,
ভাবে হাসিতেছেন।
বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ষাট-বাষট্টি,
ব্রাহ্মণ, তাই গলায় উপবীত,
পরনে থান-কাপড়, পায়ে চটিজুতা, গায়ে হাত-কাটা ফ্লানেলের জামা,
মাথার চতুষ্পার্শ্ব কামানো, মাথাটি খুব বড়, উন্নত ললাট,
একটু খর্বাকৃতি,
কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখা যায়,
দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধানো।

মিষ্টমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে কথা বলিতেছেন।
দেখিতে-দেখিতে একঘর লোক, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।
ঠাকুর বলিলেন—
আজ সাগরে এসে মিললাম।
এতদিন খাল বিল, হদ্দ নদী দেখেছি,
এইবার দেখছি সাগর।
বিদ্যাসাগর হাসিয়া বলিলেন—
তবে নিয়ে যান নোনা-জল খানিকটা।
ঠাকুর বলিলেন—
না গো, নোনা-জল কেন?
তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর,
তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন।
সকলে একদৃষ্টে দেখিতেছেন আনন্দময় পুরুষকে,
তাঁহার কথামৃত শুনিতেছেন।
সকলে অবাক, নিস্তব্ধ।
তাঁহারা দেখিতেছেন—
যেন সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ—
বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য
কথা বলিতেছেন।

বলিতে-বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরিলেন—

'মন কি তত্ত্ব করো তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে-যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥'

গাহিতে-গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ।
হাত অঞ্জলিবদ্ধ, দেহ উন্নত ও স্থির, নেত্র স্পন্দহীন।
বিদ্যাসাগর নিস্তব্ধ।
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সহাস্যে কহিতেছেন—
ভাব ভক্তি—এর মানে তাঁকে ভালবাসা,
যিনি ব্রহ্ম, তাঁকেই ডাকছে মা বলে,
মা বড় ভালবাসার জিনিস।
পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই নয়।
তাঁর উপর যদি ভালবাসা আসে
তাহলে দরকার নেই এসব কর্মের।
যতক্ষণ হাওয়া না মেলে ততক্ষণ দরকার পাখা।
দক্ষিণ হাওয়া যদি আপনি আসে—
পাখা ফেলে দেয়।

কয়েক ঘণ্টা কাটিয়াছে, রাত্রি নয়টা বাজে।
ঠাকুর বিদায় লইবেন।
বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর বলিলেন—
এসব যা বললুম বলাবাহুল্য আপনি সব জানেন,
তবে খপর নাই।
বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে,
খপর নাই বরুণ রাজার।
বিদ্যাসাগর সহাস্যে বলিলেন—তা আপনি বলতে পারেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—
একবার রাসমণির বাগান দেখতে যাবেন,
ভারী চমৎকার জায়গা।
বিদ্যাসাগর বলিলেন—যাবো বৈকি,
আপনি এলেন, আর আমি যাবো না ?
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—আমার কাছে—ছি ! ছি !
বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করিলেন—এমন বললেন কেন ?
ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—আমরা জেলেডিঙি,
যেতে পারি খাল বিল, বড় জোর নদীতে,
কিন্তু আপনি জাহাজ,

কি জানি, যেতে গিয়ে পাছে চড়ায় লেগে যায় !
তবে এসময় জাহাজও যেতে পারে।
বিদ্যাসাগর বলিলেন—হাঁ, এটি বর্ষাকাল।
মাস্টার ভাবিলেন, নবানুরাগের বর্ষা,
নবানুরাগের সময় থাকে না মান অপমান।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন।
বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন—
ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিবেন।
ঠাকুর এখনো দাঁড়াইয়া কেন ?
তিনি মূলমন্ত্র জপিতেছেন, জপিতে-জপিতে ভাবাবিষ্ট।
বুঝি যাইবার সময়—
প্রার্থনা করিতেছেন বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য।

ঠাকুর সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন ভক্তসঙ্গে।
এক ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন।
শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনো চাঁদ ওঠে নাই।
বিদ্যাসাগর স্বজনসঙ্গে আগে যাইতেছেন,
তাঁহার হাতে বাতি।
তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া,
বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া,
সকলে যাইতেছেন ফটকের দিকে।

ফটকের বাহিরে ঠাকুর পৌঁছিলে—
সুন্দর দৃশ্য !
এক গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ছত্রিশ-সাঁয়ত্রিশ,
মাথায় শিখদের ন্যায় শুভ্র পাগড়ি,
শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র
মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ।
তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—
'বলরাম ! তুমি ? এত রাত্রে ?'

বিদ্যাসাগর ও অন্য সকলে প্রণাম করিলেন ঠাকুরকে।
গাড়ি ছুটিল উত্তরাভিমুখে—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাইবে।
সকলে গাড়ির দিকে তাকাইয়া আছেন,
বুঝি ভাবিতেছেন—এ মহাপুরুষ কে ?

ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, জীবের ঘরে-ঘরে ফিরছেন,
বলছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই উদ্দেশ্য—
এ মহাপুরুষ কে ?   (৪১১-২৫)

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর বলিতেছেন—
সেজোবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্র-ঠাকুরকে দেখতে গিছলাম।
লক্ষণ দেখবার জন্য বললুম দেবেন্দ্রকে—দেখি তোমার গা।
দেবেন্দ্র জামা তুললে।
গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ানো।
একটু বিদ্যার অভিমানও আছে।
তা হবে না, অত ঐশ্বর্য, মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা !
দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে—
হঠাৎ আমার সেই অবস্থাটি হল,
সে অবস্থায় দেখতে পাই, কে কিরূপ ?
পণ্ডিত-ফণ্ডিত তখন তৃণজ্ঞান।
আমার ভিতর থেকে উঠল হি-হি হাসি।
দেখলাম, যোগ ভোগ দুইই আছে।
অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট , ডাক্তার এসেছে।
অত জ্ঞানী তবু সর্বদা থাকতে হয় সংসার নিয়ে।
বললুম, তুমি কলির জনক।
'জনক রাজা এদিক-ওদিক দুদিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটি।'
তুমি সংসারে থেকে মন রেখেছো ঈশ্বরে।
আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।
তখন শোনালে বেদ থেকে।
বললে, 'এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মতো,
আর জীব—এক একটি ঝাড়ের দীপ।'
পঞ্চবটীতে আমি যখন ধ্যান করতুম,
দেখেছিলুম, ঠিক ঐ রকম।
দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম,
তবে তো খুব বড়লোক।
অনেক কথাবার্তার পরে খুশি হয়ে দেবেন্দ্র বললে,
আপনাকে আসতে হবে উৎসবে।

আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।
আমার তো এই অবস্থা দেখছ, কখন কিভাবে তিনি রাখেন!
দেবেন্দ্র বললে, না, তোমাকে আসতে হবে,
তবে ধুতি উড়ানি পরে এসো,
তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে
কষ্ট হবে আমার।
আমি বললুম, পারবো না—আমি বাবু হতে পারবো না।
দেবেন্দ্র আর সেজোবাবু হাসতে লাগল।
পরদিনই দেবেন্দ্রের চিঠি এল সেজোবাবুর কাছে।
আমাকে আসতে বারণ করেছে।
গায়ে উড়ানি থাকবে না, অসভ্যতা হবে। (১৪১-৪২)

যদুলাল মল্লিক, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাণী রাসমণি

ঠাকুর বলিতেছেন—
ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়।
তখন খসে যায় পরনের কাপড়,
কি-একটা শিড়্‌শিড়্‌ ক'রে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠে,
আর সকলকে তৃণ জ্ঞান।
যদি দেখি, পণ্ডিতের বিবেক নাই,
ঈশ্বরে নাই ভালবাসা,
তাকে মনে হয়—খড়কুটো। (১৯১)

উন্মাদ অবস্থায় মানতুম না কাউকে।
লোককে বলে দিতুম হক্ কথা।
যদু মল্লিকের বাগানে এসেছিল যতীন্দ্র ঠাকুর।
তাকে বললুম—কর্তব্য কী?
ঈশ্বরচিন্তাই আমাদের কর্তব্য কিনা?
যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক,
আমাদের কি আর মুক্তি আছে?
যুধিষ্ঠিরই নরকদর্শন করেছিলেন।
শুনে বড় রাগ হল, বললুম—
তুমি কি রকম লোক গা,
যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনই মনে রেখেছ কেবল,

তাঁর সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি—
এসব কিছু রাখলে না মনে ?
আরও কত কি বলতে যাচ্ছিলুম,
হৃদে চেপে ধরল মুখ।
খানিক পরে যতীন্দ্র চলে গেল—'কাজ আছে' বলে।

কাপ্তেনের সঙ্গে গিয়েছিলুম সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি।
তাকে বললুম,
দ্যাখো তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারব না,
কেননা সেটা মিথ্যা কথা হবে।
সৌরীন্দ্র খানিক কথা কইলে আমার সঙ্গে।
দেখি সাহেব-টাহেব আনাগোনা করছে।
রজোগুণী লোক, নানা কাজ লয়ে আছে।

বরাহনগর ঘাটে দেখলুম,
উত্তরপাড়ার জয় মুখুজ্জে জপ করছে,
কিন্তু অন্যমনস্ক।
কাছে গিয়ে দুই চাপড়।

রাসমণি এসেছে বাগানবাড়িতে।
কালীঘরে এল।
গান গাইতে বলল আমাকে।
গান গাইছি,
দেখি অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্‌ছে।
অমনি দুই চাপড়।
তখন সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাতজোড় করে রইল।
হলধারীকে বললুম, দাদা, একি স্বভাব হল!
কি উপায় করি!
তখন মাকে ডাকতে-ডাকতে চলে গেল ও-স্বভাব। (২০৮-০৯)

হৃদয় মুখোপাধ্যায়

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান।
ঠাকুরের দর্শনমাত্রে রাজপথে পড়িল দণ্ডের ন্যায়।
হাত জোড় করিয়া কাঁদিতেছেন, বালকের মতো!

কি আশ্চর্য, ঠাকুরও কাঁদিতেছেন।
একি ! হৃদয় কত যন্ত্রণা দিয়াছিল তাঁকে,
তাহার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন, কাঁদিতেছেন !

শ্রীরামকৃষ্ণ	এখন যে এলি ?
হৃদয় (কাঁদিতে-কাঁদিতে)	তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম আমার দুঃখ বলব কার কাছে ?
শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার স্বরে)	সংসারে দুখ আছেই। তোর কিসের দুঃখ ?
হৃদয়	আপনার সঙ্গ-ছাড়া, দুঃখ তাই।
শ্রীরামকৃষ্ণ	তুই তো বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক, আমার ভাব থাক আমাতে।
হৃদয়	তা তো বলেছিলাম। আমি কি জানি ! আজ তবে আয়, আর একদিন আসিস। তখন কথা কইব বসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলিলেন,
হৃদে আমার যত সেবা করেছে, যন্ত্রণাও দিয়েছে তত।
যখন পেটের ব্যারামে দু'খানা হাড় হয়ে গেছি,
কিছু খেতে পারতুম না,
তখন আমায় বলেছে, এই দ্যাখো, আমি কেমন খাই।
আবার বলত,
বোকা, আমি না থাকলে বেরিয়ে যেত তোমার সাধুগিরি।
একদিন এমন যন্ত্রণা দিলে যে,
দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম জোয়ারের জলে।
সেবাও করেছে।
ছেলেকে যেমন মানুষ দেখে তেমনি।
আমি তো বেহুঁশ রাতদিন,
তার উপর ভুগেছি কত ব্যামোয়,
ও যে-রকম রাখত থাকতুম সেইরকম।
আচ্ছা, অত সেবা করত—
তবে কেন ওর এমন হল ! (১৩৪-৩৫,৭৬)

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রের বাড়ি আসিয়াছেন।
সুরেন্দ্র ঠাকুরকে মালা পরাইতে আসিলেন।
ঠাকুর মালা হাতে লইলেন,
পরে ফেলিয়া রাখিলেন একপাশে।

সুরেন্দ্রের বড় অভিমান হইল।
অশ্রুপূর্ণ লোচনে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া বসিলেন।
বলিতে লাগিলেন, বুঝতে পারছি আমার অপরাধ।
ভগবান পয়সার নয়, অহঙ্কারের নয়।
আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা লবেন কেন?
আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।
বলিতে-বলিতে গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা,
বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে ঘরের মধ্যে ত্রৈলোক্য গান গাহিতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন, মাতোয়ারা।
যে-মালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন,
তাহা তুলিয়া গলায় পরিলেন।
একহাতে মালা ধরিয়া, অপর হাত দোলাইয়া.
গান ও নৃত্য।
আখর দিতেছেন—
'ভূষণ বাকি কি আছে রে!
জগৎচন্দ্র হার পরেছি!'

সুরেন্দ্র আনন্দে বিভোর।
ঠাকুর মালা পরিয়া নাচিতেছেন।
সুরেন্দ্র মনে-মনে বলিতেছেন,
ভগবান দর্পহারী;
আবার তিনি কাঙালের, অকিঞ্চনের, ধন। (১০৮০)

সুরেন্দ্রের বাড়িতে দুর্গাপূজা।
ঠাকুর অসুস্থ, যাইতে পারেন নাই।
আজ বিজয়া, সুরেন্দ্রের মন খারাপ,
ঠাকুরের নিকট পলাইয়া আসিয়াছেন।

সুরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন—
ঠাকুর বলিতেছেন—
কাল সাতটা সাড়ে-সাতটার সময় ভাবে দেখলাম—
তোমাদের দালান, ঠাকুরপ্রতিমা সব জ্যোতির্ময়,
এখানে ওখানে এক হয়ে গেছে,
আলোর স্রোত বইছে,
এবাড়ি ওবাড়ি। (৫০০)

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাগবাজারে এক শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ি আসিবেন।
বাড়িটি পুরাতন ইস্টকনির্মিত। ছাতের উপর বসিবার স্থান।
সেখানে কাতারে-কাতারে লোক, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া,
সকলেই উৎসুক—কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগিনী, দুইজনই বিধবা।
একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করিতে ব্রাহ্মণী যারপরনাই শোকাতুরা।
যতক্ষণ ঠাকুর নন্দ বসুর বাড়িতে ছিলেন
ততক্ষণ ঘরবাহির করিয়াছেন,
বিলম্ব হওয়াতে ভাবিয়াছেন, বুঝি ঠাকুর আসিলেন না।
অস্থির হইয়া নন্দ বসুর বাড়ি গিয়াছেন, খবর লইতে।
এধারে ঠাকুর আসিয়া পড়িয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছাতের উপর আসনগ্রহণ করিলেন।
কাছে মাদুরের উপর মাস্টার, নারাণ, দেবেন্দ্র,যোগীন ইত্যাদি।
কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি আসিলেন।
ব্রাহ্মণীর ভগিনী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।
বলিলেন, দিদি নন্দ বসুর বাড়ি গেছেন খবর নিতে,
কিন্তু ফিরতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?
নীচে শব্দ হওয়াতে বলিতেছেন—
'ঐ বুঝি দিদি এল !'
দেখিতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—
'না আসে নাই।'

ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগিনী বলিলেন—
'ঐ দিদি আসছেন !'
ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।
কি বলিবেন, কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন না।
অধীর হইয়া বলিতেছেন—
'ওগো, আমি যে আর আহ্লাদে বাঁচি না গো,
ওগো আমার মেয়ে চণ্ডী বিয়ের পরে যখন এসেছিল,
সঙ্গে কত সেপাই-শাস্ত্রী, তারা রাস্তা পাহারা দিচ্ছিল,
তখনও যে এত আহ্লাদ হয়নি গো।
ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটুও নেই গো!
এঁর দেরী হচ্ছিল, আসেন নি,
মনে করেছিলাম, যেকালে ইনি এলেন না
সব আয়োজন ফেলে দিব গঙ্গার জলে,
ওঁর সঙ্গে আর কথা কইব না,
যেখানে উনি যাবেন, সেখানে একবার শুধু যাব,
না, কথা কইব না, দেখব অন্তরাল থেকে,
দেখে চলে আসব।'

ঠাকুর হাসিতেছেন।

ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন,
যাই সকলকে বলি,
আয়রে, আমাব সুখ দেখে যা, দেখে যা আমার ভাগ্য।
ওগো লটারিতে এক লাখ পেয়েছিল একটা মুটে,
শোনামাত্র আহ্লাদে সে মরে গিয়েছিল, সত্যি মরে গিয়েছিল—
ওগো, আমার যে তাই হলো গো!
তোমরা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করো—
না-হলে মরে যাব সত্য সত্যই।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

ব্রাহ্মণীর ভাবের আর্তিতে মোহিত সকলে।
মাস্টার তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে গেলেন।
ব্রাহ্মণী বলিতেছেন—'সে কি গো!'
ভক্তদের দেখিয়া ব্রাহ্মণী আনন্দে বলিতেছেন—
'তোমরা সকলে এসেছ, কত আহ্লাদ আমার!

ছোট নরেনকে এনেছি,
বলি, সে না হলে হাসবে কে ?

ঠাকুর হাসিতেছেন।

ব্রাহ্মণীর ভগিনী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—
'দিদি, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয় !
নীচে এসো, আমরা একলা কি পারি ?'
ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর, ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন,
ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না।

ঠাকুর হাসিতেছেন।

রাত্রি প্রায় আটটা হইল, ঠাকুর মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন।
এইবার বিদায় লইবেন।
নীচের তলায় ঘরের কোলে বারান্দা,
বারান্দা দিয়া উঠানে আসিতে হয়।
ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বারান্দা দিয়া আসিতেছেন সদর দরজার দিকে,
ব্রাহ্মণী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন—
'ও বউ, শীঘ্র পায়ের ধুলো নিবি আয়।'

ঠাকুর হাসিতেছেন।

প্রদীপ ধরিয়া সঙ্গে একজন আসিতেছেন।
আসিতে-আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হইল না।
ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—
'পিদ্দিম ধরো ! পিদ্দিম ধরো !
মনে করো না, ফুরিয়ে গেল পিদ্দিম ধরা !'

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। (৫৭৪-৭৬)

গোপাল সেন

ঠাকুর পূর্বকথা বলিতেছেন—
অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে আসত একটি ছেলে।

বছর-কুড়ি বয়স, নাম গোপাল সেন। সঙ্গে বন্ধু গোবিন্দ পাল।
ছেলেবেলা থেকেই তাদের ঈশ্বরে টান।
বিয়ের কথায় ভয়ে ব্যাকুল,
কুণ্ঠিত হত বিষয়ী দেখলে,
যেমন ইঁদুর হয় বিড়ালকে দেখলে।
গোপালের হত ভাবসমাধি।
এত ভাব যে, হৃদেকে ধরতে হত—
পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে।
একদিন হঠাৎ বললে আমার পায়ে হাত দিয়ে—
আমি তবে যাই।
সংসারে আর থাকতে পারছি না।
আপনার যেতে এখন অনেক দেরী।
আমিও ভাবাবস্থায় বললাম—
আবার আসবে।
সে বললে—আচ্ছা, আবার আসব।
কিছুদিন পরে গোবিন্দ এল।
বললে—গোপাল চলে গেছে। (৫৫,৭৭৬)

নরেন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া।
নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন।
ঠাকুরের চক্ষুর পাতা পড়িতেছে না,
নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না-বহিছে!
নরেন্দ্র গাহিতেছেন—
চিন্ময় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।'
ঠাকুর শিহরিয়া উঠিলেন, দেহ রোমাঞ্চিত.
চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত,
যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন।
গান চলিতেছে—
'হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ…'
আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য, স্তিমিত লোচন।
কোন্ অপরূপ দেখিতেছেন আর মহানন্দে ভাসিতেছেন!
হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীত উঠিতে লাগিল—
'প্রেমানন্দে হও রে চিরমগন… ।' (.২৬-২৭)

নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—
'সত্যম্ শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদি মন্দিরে··· ।'
গাহিতেছেন—'আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয়-আকাশে··· ।'
'আনন্দ অমৃতরূপে', এইকথা বলিতে-বলিতে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিমগ্ন—আনন্দময়ীর রূপসাগরে ।
এরাজ্য ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন !
সমাধিদৃষ্টে নরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন পূর্বদিকের বারান্দায় ।
সমাধিভঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ।
নরেন্দ্র নাই, তানপুরা পড়িয়া আছে ।
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—
আগুন জ্বেলে গেছে,
এখন থাকল আর গেল । (৭৮-৭৯)

নরেন্দ্র মধুর কণ্ঠে গান করিতেছেন—
'চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার ।'
'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি ।'
ডাক্তার মাস্টারকে বলিলেন—
এসব ওঁর পক্ষে ভালো নয় ।
শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে ?
মাস্টার বলিলেন, ডাক্তারের ভয় পাছে আপনার ভাবসমাধি হয় ।
ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—
না না, কেন ভাব হবে ?
বলিতে-বলিতে গভীর সমাধিতে মগ্ন ।
নরেন্দ্রের মধুর গান চলিতেছে—
'এ কি সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ ।'
'কি সুখ জীবনে মম ও-নাথ, দয়াময় হে ।'
'কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার ।'
ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিলেন ।
গান সমাপ্ত হইল ।
তখন পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের,
পুরুষ ও স্ত্রীর, আপামর সাধারণের,
সেই মনোমুগ্ধকারী কথা হইতে লাগিল ।
সভাসুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ, সকলেই মুখপানে চাহিয়া ।
সেই কঠিন পীড়া কোথায় ?
মুখ যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, ঐশ্বরিক জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত । ।
ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

লজ্জা ত্যাগ করো,
ঈশ্বরের নাম করবে, তাতে আবার লজ্জা কি !
'আমি এত বড় লোক—হরি হরি বলে নাচবো ?
অন্য বড় লোক শুনলে বলবে কি !
ওহে, ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে,
কি লজ্জার কথা ।'—
এসব সংকোচ ত্যাগ করো ।
জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও ।
অজ্ঞান-কাঁটা দূর করবার জন্য আনতে হয় জ্ঞান-কাঁটা,
তারপর জ্ঞান অজ্ঞান ফেলে দিতে হয় দুইই ।
তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার ।
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া রমণ,
সে যে কি আনন্দের, বলা যায় না মুখে,
যার হয়েছে সেই জানে । (১৯৭-৯৯)

ঠাকুর বলিতেছেন—
নরেন্দ্রকে বলেছিলাম, ঈশ্বর রসের সাগর,
তুই সে সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল্ ?
মনে কর্, খুলিভরা রস, তুই মাছি,
কোথা বসে রস খাবি ?
নরেন্দ্র বললে—মুখ বাড়িয়ে খাবো খুলির কিনারায় বসে,
কেননা ডুবে যাব বেশি দূরে গেলে ।
তখন আমি বললাম—
বাবা, এ সচ্চিদানন্দ সাগর,
অমৃতের সাগর,
এতে নেই মরণের ভয় ।
যারা অজ্ঞান তারাই বলে,
বাড়াবাড়ি করতে নাই ভক্তিপ্রেমের ।
ঈশ্বরপ্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে ? (১০৪,১১১-১২)

নরেন্দ্র সুর করিয়া কৌপীনপঞ্চক গাহিতেছেন ।
ঠাকুর যেই শুনিলেন—'অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ'—
অমনি আস্তে-আস্তে বলিতেছেন—আহা !
ইশারা করিয়া দেখাইতেছেন—এইটি যোগীর লক্ষণ ।
নরেন্দ্রকে বলিলেন, ঐ গানটা গা—
'যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায় ।'

,হরি এক দিলমে' শুনিয়া ইশারায় বলিতেছেন—
তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে আছেন, অন্তর্যামী।
নরেন্দ্র এবার বলিলেন—
আমি যদি এক পাই, নিযুত কোটি করতে পারি অনায়াসে।
তুমিও আমি আমিও তুমি, আমি বই আর কিছু নাই।
এই বলিয়া অষ্টাবক্র সংহিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।
ঠাকুর হীরানন্দকে বলিলেন—
দ্যাখো, যেন খাপখোলা তরোয়াল। (৪০৩-০৪)

ঠাকুর বলিতেছেন—
নরেন্দ্র কাউকে কেয়ার করে না।
আমার সঙ্গে কাপ্তেনের গাড়িতে যাচ্ছিল,
কাপ্তেন ভালো জায়গায় বসতে বললে—
চেয়েও দেখলে না।
আমারই অপেক্ষা রাখে না।
যা জানে তাও বলে না,
পাছে আমি বলে বেড়াই—নরেন্দ্র এত বিদ্বান।
মায়ামোহ নাই, যেন কোনো বন্ধন নাই।
খুব ভালো আধার; একাধারে অনেক গুণ;
যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লিখতে পড়তে।
আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না।
নরেন্দ্র বেশি আসে না, সে ভালই।
বেশি এলে আমি বিহ্বল হই। (৮১)

ঠাকুর বলিতেছেন—
নরেন্দ্র খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর—
পুরুষের সত্তা।
এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটিও নাই।
ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘি।
খুব বড় আধার, অনেক জিনিস ধরে।
অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল,
পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।
নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়, বশ নয় ইন্দ্রিয়সুখের।
সে পুরুষ পায়রা।
পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ছিনিয়ে নেয় টেনে,
মাদী পায়রা থাকে চুপ ক'রে। (১০২৯-৩০, ৮০৯)

সাধনার জ্বলন্ত অরণ্যে

সাজো সমরে

ঢিমে তেতালা বাজালে চলবে না।
চৌদ্দ মাসে বৎসর করলে কি হয় ?
ভিতরে জোর নাই, শক্তি নাই, যেন চিঁড়ের ফলার।
উঠে পড়ে লাগো, কোমর বাঁধো।
তীব্র বৈরাগ্য চাই।

তীব্র বৈরাগ্য হয় না কেন ?
ভিতরে যে রয়েছে বাসনা, প্রবৃত্তি।
ওদেশে জল আনে মাঠে,
মাঠের চারদিকে কাদার আল, পাছে জল বেরিয়ে যায়,
কিন্তু আলের মাঝে ঘোগ্।
জল আনছ প্রাণপণে, বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোগ্ দিয়ে '
বাসনা—ঘোগ্।

বাঁশের শট্‌কা-কল দিয়ে মাছ ধরে।
বাঁশ সোজা থাকার কথা। নোঙানো কেন ?
মাছ ধরবে বলে।
বাসনা—মাছ।
তার জন্য মন সংসারে নোঙানো।
বাসনা না থাকলে মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি—
ঈশ্বরের দিকে।

দীপশিখা চঞ্চল হয় একটু হাওয়া লাগলেই।
যেখানে হাওয়া নাই, তেমন দীপশিখা—
যোগাবস্থা। (৩৪৪)

সাধনার কালে প্রথমটা লাগতে হয় উঠে-পড়ে।

ঢেউ, ঝড়-তুফান, যেতে হচ্ছে বাঁকের কাছ দিয়ে,
তখন হাল ধরতে হয় কষে।
বাঁক পার হল, বইল অনুকূল হাওয়া,
মাঝি তখন হালে হাত ঠেকিয়ে
বসল আরাম ক'রে।
পাল টাঙাবার ব্যবস্থা ক'রে সাজতে লাগল তামাক।
কামিনী-কাঞ্চনের ঝড়-তুফান,
কাটাবার পরে—শান্তি। (৪২৫)

কেবল শুনলে কি হবে ?
কিছু করো।
সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয় না—
খেতে হয়। (২০১, ৪৪৭, ৭৪২)

দুধে মাখন আছে—
মন্থন করতে হয়।
সরষের দানাতে তেল আছে—
পিষতে হয়।
মেথিতে হাত রাঙা হয়—
বাটতে হয়।
বড় মাছ ধরবে—
আয়োজন করো।
হাতসুতো, ছিপ যোগাড় ক'রে, চার করো,
তবে তো গন্ধ পেয়ে
গভীর জল থেকে মাছ আসবে ধেয়ে।
ঈশ্বর আছেন বললে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?
সাধন করো। (১৪৩, ৩৪০)

তীব্র বৈরাগ্য চাই,
যেন খাপখোলা তরোয়াল।
সে বৈরাগ্য হলে
আত্মীয় মনে হয় কালসাপ,
গৃহ—পাতকূয়া। (৯৮২)

যে মানুষ ত্যাগ করবে, তার চাই মনের বল।
ডাকাত পড়ার ভাব।

ডাকাতি করার আগে ডাকাতরা বলে—
মারো! কাটো! লোটো! (৫২৭)

ভক্তির তমঃ আনো।
বলো—কি! রাম বলছি, কালী বলছি,
আমার আবার বন্ধন!
আমার আবার কর্মফল!! (৯০৯)

আতস কাঁচে সূর্যকিরণ পড়লে—
পুড়ে যায় জিনিস।
কিন্তু ঘরের ভিতরে ছায়া—
সেখানে পোড়াতে পারে না আতস কাঁচ।
ঘর ত্যাগ ক'রে দাঁড়াও বাইরে এসে। (৫৬৫)

ঘরের ভিতরে রত্ন যদি দেখতে চাও,
নিতে চাও,
তাহলে পরিশ্রম ক'রে, চাবি এনে,
খুলতে হবে দরজার তালা,
বার ক'রে আনতে হবে রত্ন।
নইলে কেবল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি—
এই আমি দরজা খুললুম,
এই ভাঙলুম সিন্দুকের তালা,
এই বার করলুম রত্ন—
না—ওতে হবে না। (৪৩২)

কালের জন্য প্রস্তুত হও!
কাল প্রবেশ করেছে ঘরে।
নাম-রূপ অস্ত্র নিয়ে—
যুদ্ধ করতে হবে কালের সঙ্গে। (২৩৬)

ব্যাকুল হও—পাগল হও

গুরুকে জিজ্ঞাসা করলে শিষ্য—
বলে দিন, কেমন ক'রে পাব ঈশ্বরকে?
গুরু বললেন, দেখিয়ে দিচ্ছি, এসো।

তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন পুকুরের কাছে।
দুজনেই নামলেন জলে।
গুরু হঠাৎ চুবিয়ে ধরলেন শিষ্যকে।
ছেড়ে দেবার পরে শিষ্য মাথা তুললে
গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—
কি রকম বোধ হচ্ছিল তোমার ?
শিষ্য বললে, প্রাণ যায়-যায়, আটু-পাটু করছিল।
গুরু বললেন, ঈশ্বরের জন্য যখন ঐ রকম করবে প্রাণ—
তখন জানবে দেরী নেই তাঁর সাক্ষাৎকারের।
উপরে ভাসলে কি হবে ?
ডুব দাও।
গভীর জলের নীচে আছে রত্ন,
জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লে কি হবে ?
মাণিক পেতে হলে ডুব দিতে হয় জলে। (১০৭৩, ৭১৭)

কর্মনাশা বলে একটি নদী।
সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ।
ডুব দিলে কর্মনাশ।
ডুব দাও। (১৭৮)

ডুব দাও।
উপর-উপর ভাসলে,
বা সাঁতার দিলে—
রত্ন কি পাওয়া যায় ?
ডুব দাও।
রত্ন তোলো।
তারপর অন্য কাজ।
কেউ ডুব দিতে চায় না। (৯১৯, ৭৬৪, ২১৫)

বাদুলে পোকা
যদি দেখতে পায় আলো—
আর সে কি থাকে অন্ধকারে ? (১৭৩, ৬৮৯)

তিন টান এক হলে তিনি দেখা দেন—
বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।
মায়ের সন্তানের উপর টান,
সতীর পতির উপর টান। (২০, ৪৯৭-৯৮, ৮৩২)

ব্যাকুলতা চাই।
কর্ম গেলে কেরানীর যেমন ব্যাকুলতা—
রোজ অফিসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে,
হাঁ গা, কোনো কর্মখালি হয়েছে,
তার যেমন ছটফট,
তেমনি চাই।
গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা,
বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোনো ভাবনা নেই,
এরূপ অবস্থায় হয় না ঈশ্বরলাভ। (৮৯৮)

লোকে কাঁদে।
ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য—
ঘটি-ঘটি কাঁদে।
ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বলো? (৪৯, ১৯)

পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও।
লোকে না হয় জানুক, ঈশান এখন পাগল হয়েছে।
ছুঁড়ে ফেলে দাও কোশাকুশি,
সার্থক করো ঈশান নাম। (৩৪৭)

নির্জনে সংগ্রাম

প্রথম অবস্থায় সাধন হওয়া চাই, খুব নির্জনে।
অশ্বত্থ গাছ যখন চারা, তখন বেড়া দেয় চারিদিকে।
গুঁড়ি মোটা হলে হাতি বাঁধলেও ক্ষতি নেই।
ঈশ্বরলাভের জন্য সংসারে থেকে—
একহাতে ধরবে ঈশ্বরের পাদপদ্ম,
অন্য হাতে করবে কাজ।
যখন অবসর হবে তখন ধরবে দুই হাতেই—
তাঁর শ্রীপাদপদ্ম। (১২১-২২)

নির্জন না হলে ভগবৎ-চিন্তা হয় না।
সোনা গলিয়ে গয়না গড়ব—
তা গলাবার সময়ে যদি পাঁচবার ডাকে,
গলানো হয় কেমন ক'রে?

চাল কাঁড়তে হয় একলা বসে,
দেখতে হয় এক-একবার হাতে তুলে—
কেমন সাফ হল ?
কাঁড়তে-কাঁড়তে যদি পাঁচবার ডাকে—
ভালো সাফ হবে কেমন করে ? (২৫৬)

হয় নির্জনে রাতদিন তাঁব চিন্তা,
নয় সাধুসঙ্গ।
মন একলা থাকলে শুষ্ক হয়ে যায়।
এক ভাঁড় জল রেখে দাও আলাদা ক'রে,
ক্রমে শুকিয়ে যাবে।
তাকে ডুবিয়ে রাখো গঙ্গাজলে—
শুকুবে না।
কামারশালার আগুনে লোহা লাল,
সরিয়ে নিলে যেমন কালো তেমনি কালো।
লোহাকে মাঝে-মাঝে দিতে হয় হাপরে। (১০৮৮)

নির্জনে সাধন করো।
তাতে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ।
তাবপর সংসার করলে দোষ নাই।
হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে—আঠা লাগে না।
চোর-চোর খেলায় বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে—ভয় থাকে না।
পরশমাণিক ছুঁয়ে সোনা হয়ে যাও।
তারপর হাজার বছর মাটিতে পোঁতা থাকো—
তবু সোনাই থাকবে। (৮৪)

সংসার হল জল, মনটি দুধ।
যদি জলে ফেলে রাখো—
দুধে জলে মিশে এক,
খুঁজে পাবে না খাঁটি দুধ।
দুধকে দই পেতে মাখন তুললে—
সে মাখন মিশবে না সংসার-জলে।
নির্জনে সাধনা ক'রে
তুলে নাও জ্ঞানভক্তির মাখন। (১৯)

গোপনে তাঁর নাম করতে-করতে—

কৃপা হয় তাঁর—
দর্শন তারপর।
জলের ভিতর ডুবানো আছে বাহাদুরী কাঠ—
তীরেতে বাঁধা শিকল দিয়ে।
শিকলের এক-এক পাপ্ ধরে এগোলে—
শেষে স্পর্শ করা যায়—
বাহাদুরী কাঠকে। (৭৭৯)

ধ্যানগহনে

চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়।
কথা হচ্ছে, তবু ধ্যান।
যেমন একজনের দাঁতের ব্যামো, কনকন ঝনঝন,
সর্ব কর্মের মধ্যে সেই দিকে মন,
সেই রকম। (৩৩৬-৩৭)

ধ্যান করবে—
মনে, বনে, কোণে। (১৮)

ডঙ্কাপেটা জায়গা—হৃদয়।
হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা সহস্রারে।
এগুলি আইনের ধ্যান, শাস্ত্রে আছে।
তবে তোমার যেখানে অভিরুচি—
ধ্যান করতে পারো সেখানে।
সব স্থানই তো ব্রহ্মময়,
কোথায় তিনি নেই ?
এ সমস্ত তাঁরই বিরাট মূর্তি। (৯৫৪)

সত্যের তপস্যা

সত্যকে আঁট করে থাকলে—ভগবানলাভ হয়।
মাকে ফুল হাতে ক'রে বলেছিলাম—
মা, এই নাও তোমার জ্ঞান,
এই নাও তোমার অজ্ঞান,

আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।
এই নাও তোমার শুচি,
এই নাও তোমার অশুচি,
আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।
এই নাও তোমার ভালো,
এই নাও তোমার মন্দ,
আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।
এই নাও তোমার পুণ্য,
এই নাও তোমার পাপ,
আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।
যখন এই কথা বলেছিলুম তখন বলতে পারি নাই—
মা, এই নাও তোমার সত্য,
এই নাও তোমার অসত্য।
সব মাকে দিতে পারলুম,
সত্য দিতে পারিনি। (৮২, ১৩০, ৩৮, ৫৬২)

সত্য কথা কলির তপস্যা।
সত্যে থাকবে।
তা হলেই ঈশ্বরলাভ। (৪৩৮, ৮৩১, ৮২)

আত্মদীপ জ্বালো

প্রথম মেঘ।
বর্ষা লেগেই আছে।
সূর্য দেখা যায় না।
দুঃখের ভাগই বেশি। (৫৬৪)

প্রথমে লিখতে হয় বানান ক'রে,
তারপর অমনি টেনে যাও।
সোনা গলবার সময়ে লাগতে হয় উঠে-পড়ে,
এক হাতে হাপর, অন্য হাতে পাখা, মুখে চোঙা—
যতক্ষণ সোনা না গলে।
গলার পরে যেই ঢালা হল গড়নেতে—
অমনি নিশ্চিন্ত। (৬৩২)

মাটি পাট করা না হলে তৈরী হয় না হাঁড়ি।
ভিতরে ঢিল বা বালি থাকলে ফেটে যায় তা।
আরশিতে ময়লা থাকলে দেখা যায় না মুখ,
চিত্তশুদ্ধি বিনা হয় না স্বরূপ দর্শন। (৭৭১)

নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়।
চাতক পাখির বাসা নীচে,
কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। (২৩১-৩২)

শুধু কাঁচের উপর ছবি থাকে না।
কাঁচের পিঠে কালি লাগালে
তবে ছবি।
ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনলে হয় না,
অনুরাগ-ভক্তির কালি মাখানো থাকলে—
তবে ধারণা হয় কথাগুলির।
তবে তাদের ধরে রাখা যায়। (১০৮৭, ৯০৫)

জ্ঞান হলেও সর্বদা অনুশীলন চাই।
ঘটি একদিন মাজলে কি হবে?
ফেলে রাখলে আবার পড়বে কলঙ্ক। (৭৭১)

কাঠে আগুন আছে, এই বিশ্বাস—
আর কাঠ থেকে আগুন বার ক'রে
ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি ও তৃপ্তি—
দুটো ভিন্ন জিনিস। (১১৯)

পরিষ্কার করো হৃদয়-মন্দির,
তারপর ঠাকুরপ্রতিমা, পূজার আয়োজন।
কোনো আয়োজন নেই, শুধু ভোঁ-ভোঁ শাঁখ—
তাতে হবে কি! (৮৮১)

ঘরে যদি আলো না জ্বলে
সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন।
দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নাই।
জ্ঞানদীপ জ্বালো।
'জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দ্যাখো না।' (৬৬, ২৩)

অধিকারী ভেদ আছে।
মার পাঁচ ছেলে।
বাড়িতে মাছ এসেছে।
মা করেছেন মাছের নানা ব্যঞ্জন,
যার পেটে যা সয়।
মাছের পোলাও, মাছের অম্বল,
মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা.
যার যা রুচি। (১৮, ২১৯)

আগে কলাগাছ বিঁধতে শেখো.
তারপর শল্‌তে,
তারপর পাখি উড়ে যাচ্ছে—
এইভাবে। (৩৯১)

সবই যথাকালে, যথাকারণে

সময় না হলে হয় না কিছুই।
কাঁচা অবস্থায় ফোড়া কাটলে হিতে বিপরীত।
পাকলে তবে অস্ত্র করে ডাক্তার।
ছেলে বলেছিল, মা, আমি এখন ঘুমুই,
আমাকে তুলে দিও বাহ্যে পেলে।
মা বললে. বাবা, তোমার বাহ্যেই তুলবে তোমাকে,
আমায় আর তুলতে হবে না। (৮৮৪)

যখন রোগ ভালো হয়ে এল, কবিরাজ বললে—
এই পাতাটি বেটে খেও মরীচ দিয়ে।
ভালো হয়ে গেল রোগ।
তা মরীচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভালো হল,
নাকি আপনি ভালো হল ?
কে বলবে !

সবই হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়।
এখানে এসে যদি তোমার চৈতন্য হয়—
আমাকে জানবে হেতু মাত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হয়। (৯৭৭).

ডিমের ভিতর ছানা বড় না হ'লে ঠোকরায় না পাখি।
সময় হলেই ডিম ফোটায় সে।
বড় গাছ কাটবার সময় সবটা প্রায় কাটা হলে
সরে দাঁড়াতে হয় একটু দূরে,
মড়মড় ক'রে আপনি ভেঙে পড়ে গাছটা।
খাল কেটে নদীর কাছাকাছি গিয়ে সরে দাঁড়ায় লোকে,
ভিজে মাটি পড়ে যায় আপনি,
আর হুড়-হুড় ক'রে নদীর জল ঢুকে পড়ে খালে। (৬৬০-৬১)

হৃদের ছেলে খেলা করছিল পায়রা লয়ে,
পায়রাকে ডাকছে—'আয় তি তি।'
পায়রা লয়ে যেই তৃপ্ত হয়ে গেল—
অমনি কাঁদতে লাগল।
অচেনা লোক এসে বললে,
আয়, তোকে লয়ে যাচ্ছি মায়ের কাছে—
তার কাঁধে চড়ে তখনি চলল। (৬৭৪)

ছেলে যতক্ষণ চুষি নিয়ে ভুলে থাকে,
মা ততক্ষণ বাড়ির কাজ, রান্নাবান্না ক'রে যায়।
ছেলের যখন ভালো লাগে না চুষি,
তা ফেলে দিয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদে—
মা তখন ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে,
ছুটে আসে দুড়্ দুড়্ ক'রে,
ছেলেকে তুলে লয় কোলে। (৪৯)

অনেকটা হয় পূর্বজন্মের সংস্কারে,
লোকে মনে করে—হঠাৎ হচ্ছে।
একজন সকালে মদ খেয়েছিল একপাত্র—
তাতেই বেজায় মাতাল, ঢলাঢলি।
লোকে অবাক, একপাত্রে এত মাতাল!
একজন বললে, ওরে, ও-যে মদ খেয়েছে সারারাত।

হনুমান সোনার লঙ্কা দগ্ধ করলে।
লোকে অবাক, একটা বানরে সব পুড়িয়ে দিলে!
আসল কথা—লঙ্কা পুড়েছিল সীতার নিশ্বাসে,
আর রামের কোপে। (৩৩৭)

ঠিক—বেঠিক সাধু

সাধক দু' রকমের।
একরকম সাধকের বানরের ছা'র স্বভাব।
আর এক রকমের স্বভাব—বিড়ালের ছা'র।
বানরের ছা মাকে আঁকড়ে ধরে যো-সো ক'রে।
বিড়ালের ছা মাকে ধরতে পারে না নিজে,
এক জায়গায় পড়ে থেকে কেবল মিউ-মিউ করে।
মা তাকে এখানে-ওখানে,
কখনো বিছানার উপরে, কখনো ছাতে কাঠের আড়ালে,
মুখে ক'রে রেখে দেয় তুলে।

যেমন, কোনো সাধক মনে করে—
আমাকে এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান তপস্যা—
তবে পাব ভগবানকে।
এদের বানরের ছা'র স্বভাব।
আবার কোনো সাধক হিসেবের সাধনা জানে না,
কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে-কেঁদে ডাকে।
কান্না শুনে থাকেতে পারেন না তিনি,
এসে দেখা দেন।
এদের বিড়ালের ছা'র স্বভাব। (২০, ৪৫৮)

জীব চার থাক—
বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত, নিত্য।
সংসার—জাল ; জীব—মাছ ; ঈশ্বর—জেলে।
জেলের জালে মাছ পড়ে।
কতক মাছ চেষ্টা করে জাল ছিঁড়ে পালাতে—
মুমুক্ষু জীব।
সবাই পারে না পালাতে, কেউ-কেউ পারে,
ধপাং ক'রে পালায়,
লোকে বলে, ঐ মাছটা বড় ছিল, পালিয়ে গেল—
মুক্ত জীব।
কিছু মাছ এত সাবধান যে জালে পড়েই না—
নিত্য জীব।
কিন্তু অধিকাংশই পড়ে জালে,
জালে পড়েই জালসুদ্ধ চোঁ-চোঁ দৌড়,

একেবারে পাঁকে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা,
জানে না, জেলে হড়্‌হড়্‌ ক'রে এখনি আড়ায় টেনে তুলবে।
বদ্ধ জীব। (২৩, ৫৬)

সত্ত্বগুণী ভক্ত ধ্যান করে অতি গোপনে,
হয়ত মশারির ভিতর,
সবাই জানে, উনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাতে ঘুম নাই,
তাই উঠতে দেরী হচ্ছে।
এদিকে শরীরের আদর কেবল পেট-চলা পর্যন্ত,
শাকান্ন পেলেই হল,
খাবার ঘটা নাই, আড়ম্বর নাই পোশাকের,
আসবাবের জাঁক নাই বাড়িতে,
তোষামোদ ক'রে ধন লয় না কখনো।

ভক্তির রজঃ আছে এমন ভক্তের হয়ত তিলক আছে,
কিংবা রুদ্রাক্ষের মালা, মধ্যে-মধ্যে সোনার দানা,
পূজার কালে পরনে গরদের কাপড়।
যেন সাইনবোর্ড মেরে বসা।

ভক্তির তমঃ যার—জ্বলন্ত বিশ্বাস তার।
ঈশ্বরের কাছে এমন জোর যে,
ডাকাতি ক'রে যেন ধন কেড়ে নেবে,
মারো! কাটো! লোটো!
কি? আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ?
আমি তাঁর ছেলে, তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী।
এমনি রোখ্‌। (৪৬-৪৭, ৯৩২)

যাঁর প্রাণ মন অন্তরাত্মা
ঈশ্বরে গত,
তিনিই সাধু। (৯০)

বৈরাগ্য দুই প্রকার—
তীব্র আর মন্দ।
মন্দ বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে।
তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুর,
মায়াপাশ কেটে দেয় কচ্‌কচ্‌। (৬৮৮-৮৯)

একাদশী তিন প্রকার।
প্রথম—নির্জলা একাদশী, জল পর্যন্ত খাবে না।
দ্বিতীয়—দুধ সন্দেশ খেয়ে একাদশী।
তৃতীয়—লুচি-ছক্কা-খাওয়া একাদশী,
পেট ভরে খাচ্ছে, দুখানা রুটি হয়ত ভিজছে—
পরে খাবে। (৯৫২)

আবার গেরুয়া কেন?
একটা কিছু পরলেই হল!
একজন বলেছিল, চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী।
আগে সে গাইত চণ্ডীর গান,
এখন বাজায় ঢাক।
সংসারের জ্বালায় জ্বলে কেউ পরেছে গেরুয়া।
সে বৈরাগ্য টেকে না।
হয়ত কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী গেছে,
তিনমাস পরে ঘরে পত্র এল—
আমার একটি কর্ম হইয়াছে,
কিছুদিন পরে বাড়ি যাইব,
তোমরা ভাবিও না। (৬৭, ৬৮৮-৮৯)

সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—
যেমন সুন্দরীর পক্ষে—গায়ের বোঁটকা গন্ধ।
ও গন্ধে—সৌন্দর্য বৃথা। (৬৯৯)

মনে আসক্তি,
মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে,
বাইরে গেরুয়া—
ভয়ঙ্কর। (৬৭)

সাধুর কমণ্ডলু ঘুরে আসে চার ধাম,
কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো।
মলয়ের হাওয়া যে-গাছে লাগে সে চন্দন হয়ে যায়,
কিন্তু হয়না—শিমূল, অশ্বত্থ, আমড়া।
কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে—
গাঁজা খাবার জন্য। (৮৭৭)

সাধুর সঙ্গে পুঁটুলি, পনরটা গাঁটওলা কাপড়ের বুঁচকি,
সে সাধুকে বিশ্বাস করো না।
বটতলায় দেখেছি, ঐ রকম সাধু, জন দুই-তিন বসে,
কেউ বাছছে ডাল, কেউ করছে সেলাই,
কিংবা বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গপ্প—
'আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া,
সাধু লোককো বহুত খিলায়া,
পুরী, জিলেবি, পেঁড়া, বরফি, মালপুয়া,
বহুত চিজ্।'

ঈশ্বরে যদি প্রেম থাকে—
তখন কর্ম নাই, সব ত্যাগ।
সময় হয়েছে, এখন সব ছেড়ে বলো—
'মন তুই দ্যাখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ না দ্যাখে।' (৮৫-৮৬)

সর্বনাশা সিদ্ধাই

সিদ্ধাই থাকা মহা গোল।
এক সিদ্ধ বসে আছে সমুদ্রের ধারে,
হঠাৎ এল ঝড়।
ঝড়ে কষ্ট হতে সে বলল,
ঝড় থেমে যাক।
ঝড় থেমে গেল।
পালভরে আসছিল এক জাহাজ।
হঠাৎ ঝড় থামতে জাহাজ গেল ডুবে।
ডুবল জাহাজসুদ্ধ লোক।
এতগুলো লোকের মৃত্যুর পাপ লাগল লোকটিতে,
সেই পাপে গেল সিদ্ধাই,
উপরন্তু নরকভোগ। (২৯৮-৯৯)

এক সাধুর খুব সিদ্ধাই, সেজন্য বড় অহঙ্কার।
ভগবান এলেন সাধুর ছদ্মবেশে।
বললেন, মহারাজ, শুনছি আপনার খুব শক্তি!
এই সাধু ওঁকে বসালেন খাতির ক'রে।

একটা হাতী যাচ্ছিল সেখান দিয়ে।
নতুন সাধু বললেন, আচ্ছা মহারাজ,
আপনি ইচ্ছা করলে মেরে ফেলতে পারেন হাতীটাকে ?
এই সাধু বললেন, অ্যাসা হোনে শেকৃতা।
এই বলে ধুলো পড়ে যেই ছুঁড়েছেন হাতীর গায়ে
অমনি সে মরে গেল ছটফট ক'রে।
নতুন সাধু বললেন, উঃ কী আপনার শক্তি !
আচ্ছা, আপনি বাঁচাতে পারেন ওটাকে ?
এই সাধু বললেন, ওভি হোনে শেকৃতা।
এই বলে ধুলো পড়ে ছুঁড়লেন,
আর হাতীও উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে।
নতুন সাধু মুগ্ধ।
সত্যি, সন্দেহ নেই, অদ্ভুত আপনার শক্তি।
কিন্তু মহারাজ, জিজ্ঞাসা করি—
এতে আপনার হল কি ?
এতে কি ভগবান পেলেন ?
এই বলেই নতুন সাধু অন্তর্ধান। (২৯৯)

যারা হীনবুদ্ধি, ঈশ্বরের কাছে তারাই চায় সিদ্ধাই।
বড় মানুষের কাছে কেউ যদি কিছু চেয়ে ফেলে—
সে আর পায় না খাতির,
তাকে নেয়না এক গাড়িতে।
যদিবা নেয় তো দেয়না কাছে বসতে। (৭০২)

সংসার দুর্গে

কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভালো।
যুদ্ধ করতে হবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার সঙ্গে—
যুদ্ধ ভালো—সংসারে থেকেই।
কলিতে অন্নগত প্রাণ, হয়ত খেতেই পেলে না,
তখন ঘুচে যাবে ঈশ্বর-টীশ্বর।
একজন বলেছিল তার মাগকে,
আমি চললুম সংসার ত্যাগ ক'রে।
মাগটি ছিল জ্ঞানী।
সে বললে, ঘুরে বেড়াবে কেন ?

হাঁ, যেতে পারো—
যদি তোমাকে পেটের জন্য ঘুরতে না হয় দশ ঘরে।
তেমন হলে এক ঘরই ভালো। (১২২, ৯০৫, ৬৮৯, ১৪১)

সার্কাসের বিবি একপায়ে কেমন ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে,
বন্-বন্ দৌড়চ্ছে ঘোড়া।
কত কঠিন, অনেক দিনের অভ্যাস, তবে তো হয়েছে।
একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভাঙবে,
মৃত্যুও হতে পারে।
সংসারে ধর্ম কঠিন ঐরূপ।
সংসার করতে-করতে কেউ বদ্ধ হয়ে যায় আরও,
ডুবে যায়।
মৃত্যুযন্ত্রণা। (৮৭৬)

সাধক যখন শবসাধন করে—
শবটা ভয় দেখায় হাঁ ক'রে।
তাই রাখতে হয় চাল, ছোলাভাজা,
দিতে হয় তার মুখে মাঝে মাঝে।
শবটা ঠাণ্ডা হলে জপ করতে পারবে নিশ্চিন্তে।
পরিবারদেব ঠাণ্ডা রাখতে হয। (৯০৫)

যে সংসারত্যাগী—সে তো ডাকবেই ঈশ্বরকে।
তার বাহাদুরী কি ?
সংসারে থেকে যে ডাকে—সেই ধন্য।
বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে সে দ্যাখে।
সে-ই বীরভক্ত, সে-ই বাহাদুর। (৫৭৩, ১১৬)

মায়া ও দয়া

লোককে খাওয়ানো একরকম তাঁরই সেবা।
সকল জীবের ভিতর আছেন তিনি, অগ্নিরূপে,
খাওয়ানো—আহুতি দেওয়া—তাঁকে। (৯৮)

যার দয়া নাই,
মানুষই নয় সে। (১২৩)

দয়া আর মায়া—এ দুটি আলাদা।
মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা।
যেমন, বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্রে ভালবাসা।
দয়া—সর্বভূতে ভালবাসা, সমদৃষ্টি।
দয়া থেকে সেবা—সর্বভূতে।
মায়াও ঈশ্বরের।
তার দ্বারা তিনি সেবা করিয়ে লন আত্মীয়দের।
তবে মায়াতে অজ্ঞান ক'রে রাখে, বদ্ধ করে।
দয়াতে চিত্তশুদ্ধি,
ক্রমে বন্ধনমুক্তি। (৮৮৩)

শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকগুলিকে ভালবাসি,
কি ভালবাসি, শুধু পরিবারের লোকদের,
এর নাম মায়া।
শুধু দেশের লোকদের ভালবাসা—
সেও মায়া।
সব দেশের লোককে ভালবাসা,
সব ধর্মের লোককে,
সেটি হয় দয়া থেকে।
দয়া থেকে হয় ঈশ্বরলাভ।
শুকদেব, নারদ—এঁরা দয়া রেখেছিলেন। (১০৪)

একান্ত জীবনে

যখন বাহির লোকের সঙ্গে মিশবে—
তখন মিশে যাবে যেন এক হয়ে,
ভালবাসবে সকলকে,
রাখবে না বিদ্বেষভাব।
জানবে, সকলের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি,
তা জেনে মিশবে, যতদূর পারো।
তারপর ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে—
শান্তি আর আনন্দ।
তখন আপনাতে আপনি থাকো।
'জ্ঞানদীপ জেবলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দ্যাখো না।'
রাখাল যায় গরু চরাতে,

মাঠে এক হয়ে যায় সব গরু,
সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরে—
আবার পৃথক।
'আপনাতে আপনি থাকো মন।' (১৩১)

মানুষে বেশি প্রকাশ

মানুষ, আর মানহুঁস।
যার চৈতন্য হয়েছে—
সেই মানহুঁস। (৮৩১, ৭৯৩)

মানুষ কি কম গা ?
মানুষ চিন্তা করতে পারে —অনন্তকে।
জীবজন্তুর ভিতরে, গাছপালার ভিতরে, সর্বভূতে,
তিনি আছেন।
কিন্তু বেশি প্রকাশ—মানুষে। (৯৬৩)

প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয়—
মানুষে হবে না ?
মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—
মানুষে হবে না ?
এমনও বলেছে,
শালগ্রাম হতে বড়—
মানুষ।
নরনারায়ণ। (৯৪৬, ৬৮৫)

মানুষে যখন তিনি অবতীর্ণ হন—
তখন ধ্যানের খুব সুবিধা।
মানুষের ভিতর নারায়ণ।
দেহটি আবরণ—
যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো।
অথবা দেখছি—
শার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিস। (৯৪৬)

ঈশ্বরকে যদি খোঁজো—

খুঁজবে মানুষে।
যে-মানুষে দেখবে উথলে পড়ছে প্রেম ভক্তি,
ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা, পাগল,
সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো—
অবতীর্ণ তিনি।   (১৫৩)

এই মানুষের ভিতর আছে—
মানুষ-রতন।   (৯৩৫)

জীবনের যবনিকা

জন্ম ও জীবনের যন্ত্রণা

ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে কেন ?
সে কাঁদে এই বলে—
গর্ভে ছিলাম, ছিলাম যোগে।
এখন 'কাঁহা-এ কাঁহা-এ'—
এ কোথায়, এ কোথায় ?
এলুম কোথায় ! (১৩৮)

সুখ দুঃখ দেহধারণের ধর্ম।
শ্রীমন্ত বড় ভক্ত,
তার মা খুল্লনাকে ভগবতী ভালবাসতেন কত।
সেই শ্রীমন্তকে নিয়ে গিয়েছিল মশানে—কাটতে।
কারাগারে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর দর্শন পেলেন দেবকী,
কিন্তু ঘুচল না কারাগার।
প্রারব্ধ কর্মের ভোগ।
এক কাণা গঙ্গাস্নান করল, ঘুচে গেল পাপ,
কিন্তু ঘুচল না কাণা চোখ।
কাঠুরে পরম ভক্ত,
দর্শন পেল ভগবতীর,
তিনি তাকে ভালবাসলেন, কৃপা করলেন,
তাকে কিন্তু খেতে হবে সেই কাঠ কেটেই।
তবে, দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক,
ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকেই, যাবার নয়।
দ্যাখো না, পাণ্ডবদের অত বিপদ—
অথচ একবারও চৈতন্য হারায় নাই। (৭৭)

আমি

জ্ঞান বিচারে থাকে না 'আমি'।

প্রথম ছাড়ালে পেঁয়াজের খোসা লাল,
তারপর পুরু সাদা,
ছাড়াতে-ছাড়াতে,
শেষে ভিতরে পাওয়া যায় না কিছু। (৪৮)

অহঙ্কার—উঁচু ঢিপি,
বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়।
নীচু জমিতে জল জমে, অঙ্কুর হয়,
গাছ হয়,
এবং ফললাভ। (২৯৯)

'আমি'-ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে—
ক'রে ফেল সমভূমি। (৬৭৪)

মনে একটুও আসক্তি থাকলে—
পাওয়া যায় না তাঁকে।
সুতোর ভিতরে একটুও আঁশ থাকলে—
যাবে না ছুঁচের ভিতর। (২৯১, ৬২৫)

দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি।
বিষয়বুদ্ধি থাকলে সোঽহং হয় না।
সংসারীরা সর্বদা থাকে বিষয়চিন্তায় :
তাই সংসারীর পক্ষে—
দাসোঽহম্। (৮৮৬)

যদি একান্ত 'আমি' না যায়—
থাক শালা দাস-আমি হয়ে। (১৭১)

দাস-আমিতে দোষ নাই।
ঈশ্বরের দাস আমি, তাঁর ভক্ত—
এই অভিমান।
এতে বরং ঈশ্বরলাভ হয়। (৬৩)

দাস-আমি—আমির মধ্যে নয়।
মিছরি নয় মিষ্টির মধ্যে।
অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে,

মিছরিতে অম্লনাশ।
শব্দের মধ্যে নয়—
ওঁকার। (৫৫৯)

বিজ্ঞানী ভক্তি লয়ে থাকে—
তার কারণ, 'আমি' যায় না।
সমাধি অবস্থায় যায়—
পরে আবার এসে পড়ে।
অশ্বত্থ-গাছ এই কেটে দিলে,
মনে করলে, মূলসুদ্ধ গেল,
পরদিন সকালে দ্যাখো—
আবার ফেকড়ি। (৬৩, ৪১৯)

যতক্ষণ 'আমি'-বোধ, ততক্ষণ সব আছে,
'স্বপ্নবৎ' বলার জো নাই।
নীচে আগুন জ্বলছে,
হাঁড়ির ভিতরে ভাত ডাল আলু পটল,
টগবগ করছে, লাফাচ্ছে ;
বলছে—আমি আছি ! আমি আছি ! (৯০৪)

'আমি'-জ্ঞানই আবরণ।
নরেন্দ্র বলেছিল—
এ আমি যত যাবে
তাঁর আমি আসবে তত। (৯৩৪)

যতক্ষণ না 'তুঁহু, তুঁহু', ততক্ষণ গতায়াত, পুনর্জন্ম।
'আমার আমার' বললে হবে কি !
বাবুর সরকার বলে—
এটা আমাদের বাগান, আমাদের কেদারা, খাট।
বাবু যখন তাড়িয়ে দেন—
নিজের আমকাঠের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতাও
থাকে না তার। (৯৩৪)

'আমি মুক্ত'—এই অভিমান খুব ভালো।
'আমি মুক্ত' বলতে-বলতে
মুক্ত হয়ে যায়।

'আমি বদ্ধ' বলতে-বলতে
বদ্ধই হয়ে যায়। (৭৬)

সংসারী লোকের 'আমি'—
যেন চারিদিকে পাঁচিল, মাথায় ছাত,
বাইরে দেখা যায় না কোনো জিনিস।

অবতারাদির 'আমি' পাতলা,
তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় ঈশ্বরকে সর্বদা।
তাঁরা যেন ফোকরওলা পাঁচিল,
দুই দিকেই অনন্ত মাঠ,
ফোকর দিয়ে দেখা যায়—অনন্ত। (৫৩৬-৩৭)

গরুগুলো হাম্মা-হাম্মা, আমি আমি, করে।
তাই ওদের অত যন্ত্রণা।
সকাল থেকে সন্ধ্যা, লাঙল টানতে হয়,
কসাই কাটে, জুতো করে, ঢোলের চামড়া হয়,
যন্ত্রণার নেই শেষ।
শেষে নাড়ি ভুঁড়ি থেকে তৈরী হল ধুনুরীর তাঁত,
ধুনুরীর হাতে উঠল বোল—
তুঁহু তুঁহু, তুমি তুমি।
তবে নিস্তার। (৯১, ৯৯, ১২৮, ২৩১)

জ্ঞানলাভের পরেও কোথা এসে পড়ে 'আমি'।
স্বপনে দেখেছিলে বাঘ,
জাগার পরেও বুক দুর্ দুর্।
'আমি' লয়েই যত যন্ত্রণা। (৪১৯)

মাঝেখানে 'আমি' আছে বলে
জীবে ও আত্মায় প্রভেদ।
জলের উপর লাঠি ফেলে দিলে—
দেখায় দুটো ভাগ।
কিন্তু জল একই। (৭২)

সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে—
অহং-রূপ লাঠি।

অহং-লাঠি তুলে নিলে—
সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র,
অভিন্ন।
মহাসমুদ্র।
উপরে, নীচে, সম্মুখে, পিছনে, ডাইনে, বামে—
অনন্ত জলরাশি।
জলের মধ্যে কুম্ভ।
ভিতরে জল, বাইরে জল, জলে জল—
তবু কুম্ভ আছে।
'আমি'-রূপ কুম্ভ। (৩৭২, ৪৮৬, ৫৮৫)

তিনিই রেখে দিয়েছেন—'আমি'।
তাঁর খেলা—তাঁর লীলা।
এক রাজার চার বেটা।
চারজনই রাজার ছেলে,
কিন্তু খেলা করছে—কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল।
রাজার বেটা হয়েও খেলছে কোটাল হয়ে। (৫৮৫)

মন

মন ধোপাঘরের কাপড়।
লাল রঙে ছোপাও—লাল,
নীলে—নীল,
যে রঙে ছোপাবে—
সেই রঙ। (৭৫৯)

কর্তাভজারা মন্ত্র দেবার সময়ে বলে—
'মন তোর।'
এখন সব তোর মনের উপর নির্ভর।
তারা বলে, যার ঠিক মন,
তার ঠিক করণ,
তার ঠিক লাভ। (২২১)

একটা জিনিস দেখতে কতগুলো জিনিস দরকার—
চক্ষু—আলো—মন।

তিনটের একটাকেও বাদ দিলে হবে না দর্শন।
মনের কাজ যতক্ষণ চলছে তুমি কেমন ক'রে বলবে—
জগৎ নাই, কি আমি নাই ?
মনের নাশ হলে তবে সমাধি—
ব্রহ্মজ্ঞান।
গুরু শিষ্যকে বলেছিল—
তুমি আমায় মন দাও,
আমি তোমায় দিচ্ছি জ্ঞান। (৮০২, ৫৪৫)

মিথ্যা কিছুই ভালো নয়।
ভালো নয় মিথ্যা ভেক।
মিথ্যা বলতে বা করতে ভয় ভেঙ্গে যায় ক্রমে।
অভিনয়েও মিথ্যা ভালো নয়।
মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে—
মনে মিথ্যার রঙ ধরে। (৬৭, ৯৬০)

মন পড়েছে ছড়িয়ে,
কুড়ুতে হবে মন,
কুড়িয়ে এক জায়গায়।
ষোল আনার কাপড় যদি চাও—
কাপড়ওয়ালাকে দিতে হবে ষোল আনা!
টেলিগ্রাফের তারে যদি ফুটো থাকে—
তাহলে যাবে না খবর। (৩৪৪)

সব মন কুড়িয়ে যদি
আমাতে এল,
তাহলে তো সব হয়েই গেল। (৭৯৭)

নিক্তির কাঁটা।
একদিকে ভার পড়লে
এক হয় না উপরের কাঁটা নীচের কাঁটা।
উপরের কাঁটা—ঈশ্বর।
নীচের কাঁটা—মন।
দুই কাঁটার এক হওয়ার নাম—
যোগ। (৩৪৪, ৪২৬)

মন যোগীর বশ,
যোগী নয় মনের বশ। (২৫৯)

যোগীর মন সর্বদা ঈশ্বরে।
সর্বদাই আত্মস্থ।
চক্ষু ফ্যাল-ফেলে।
যেমন পাখি ডিমে 'তা' দিচ্ছে,
সব মন ডিমের দিকে,
উপরে চেয়ে আছে নামমাত্র। (৪২৬)

এমনি মহামায়ার মায়ায়

যতক্ষণ আছে মায়া-মেঘ,
ততক্ষণ কাজ করে না জ্ঞান-সূর্য।
মায়াঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে—
জ্ঞান-সূর্য নাশ করে অবিদ্যা।
ঘরের ভিতরে থাকলে—
আতশ কাঁচে পোড়ে না কাগজ।
ঘরের বাইরে যখন রোদ—
তখন কাগজ পোড়ে কাঁচের আগুনে।
বাইরে মেঘ থাকলেও হবে না।
মেঘ সরলে তবে তো কাগজে ধরবে আগুন। (৭৭৪)

মহামায়া দ্বার ছাড়লে তবে দর্শন হয় তাঁর।
রাম, সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন,
আগে রাম, মাঝে সীতা, পিছনে লক্ষ্মণ,
রাম আড়াই হাত তফাতে,
তবু লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না তাঁকে। (৪৯৯)

স্বয়ং ঈশ্বর দেহধারণ করেছেন—
তিনিও মুগ্ধ ভুবনমোহিনী মায়ায়।
সীতার জন্য রাম
কেঁদে-কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। (৫৪৭)

হিরণ্যাক্ষ বধের জন্য বরাহ অবতার হলেন নারায়ণ।

হিরণ্যাক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ চান না স্বধামে ফিরতে।
তিনি বরাহ হয়ে আছেন, ছানাপোনা হয়েছে,
তাদের নিয়ে বেশ আনন্দ।
দেবতারা ভাবলেন, এ কি হল ?
ঠাকুর যে চান না আসতে !
শিবের কাছে নিবেদন করলেন ব্যাপারটা।
শিব গিয়ে জেদাজেদি করলেন খুবই,
বরাহ কিন্তু ছানাপোনাদের মাই দিয়েই চলেছেন।
তখন ত্রিশূল দিয়ে শিব ভেঙে দিলেন শরীর।
তারপরেই নারায়ণ হি-হি ক'রে হেসে—
চলে গেলেন স্বধামে। (২৮৫)

সূর্য জ্বলছে।
তবু তাকেই ঢেকে ফেলে সামান্য মেঘ।
এই দ্যাখো আমার হাতের গামছাখানা,
মুখের সামনে আড়াল করছি,
আমি এত কাছে, অথচ দেখতে পাচ্ছ না আমাকে।
ঈশ্বর সবচেয়ে নিকট তোমার,
তবু দেখতে পাও না মায়া-আবরণের জন্য। (৬০)

মায়ার রাজ্যে বাস করে মানুষ।
হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল,
সেটিকে রেখেছিল বাগানে ঘাস খাওয়াবার জন্য।
হৃদেকে জিজ্ঞাসা করলাম,
ওটাকে রোজ এখানে বেঁধে রাখিস কেন ?
সে বললে, মামা, এঁড়েটিকে পাঠিয়ে দেব দেশে,
বড় হলে লাঙল টানবে।
যাই সেকথা বলেছে, অমনি পড়ে গেলাম মূর্ছিত।
কি মায়ার খেলা !
কোথায় কামারপুকুর, সিওড়, আর কোথায় কলকাতা !
এই বাছুরটি যাবে ততখানি পথ, সেখানে বড় হবে,
তার কতদিন পরে টানবে লাঙল !!
এরই নাম সংসার, এরই নাম মায়া।
মূর্ছা ভেঙেছিল অনেকক্ষণ পরে। (৭৩)

মা মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন মহামায়ায়।

কাঁটাঘাস খেয়ে উটের মুখে দরদর রক্ত পড়ে,
তবু আবার খায়।
প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে,
ওগো, আর স্বামীর কাছে যাব না।
ভুলে যায়। (৮৮৭)

ঘুনীর মধ্যে মাছ।
যে-পথ দিয়ে ঢুকছে সে—
বেরিয়ে আসতে পারে সেই পথ দিয়ে।
কিন্তু জলের মিষ্ট শব্দ, অন্য মাছের সঙ্গে খেলা,
তাই ভুলে থাকে,
বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে না। (৮৭৭)

বদ্ধজীব—সংসারী জীব—যেন গুটিপোকা।
মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে,
কিন্তু ঘর বানিয়েছে নিজে,
ছেড়ে আসতে মায়া হয়।
শেষে মৃত্যু। (২৩৩)

চোর সদলে এসেছে ক্ষেতে চুরি করতে।
সেখানে আছে খড়ের মানুষ-মূর্তি।
চোর ঢুকতে পারছে না কোনমতে।
দলের একজন কাছে গিয়ে দেখলে—
খড়ের ছবি।
ফিরে এসে বললে—ভয় নেই।
তবু অন্যেরা আসতে চায় না,
দুর্‌দুর্ করছে বুক।
তখন এ-লোকটি ভূঁয়ে শুইয়ে দিলে মূর্তিটি,
বললে, এ কিছু নয়, এ কিছু নয়।
নেতি নেতি। (৫৮৬)

তাঁর লীলা।
অন্ধকার না থাকলে বোঝা যায় না—
আলোর মহিমা।
'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভালো' জ্ঞান।
খোসাটি আছে বলে আম বাড়ে, পাকে।

আম তয়ের হয়ে গেলে ফেলে দিতে হয় খোসা।
মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া—আমের খোসা।
দুইই দরকার। (৮৯১)

আমি তাঁকে কখনো ভালো ভাবি,
কখনো মন্দ।
তাঁর মহামায়ার ভিতর রেখেছেন আমাদের,
কখনো জ্ঞানে, কখনো অজ্ঞানে।
অজ্ঞান চলে যায়, ফিরেও আসে।
পানায় ঢাকা পুকুর,
ঢিল মারলে দেখা যায় খানিক জল,
সে জলটুকু পানা আবার ঢেকে ফেলে—
নাচতে নাচতে ফিরে এসে। (৯১১)

মায়াকে যদি চিনতে পারো—
সে অমনি পালাবে লজ্জায়।
একজন ভয় দেখাচ্ছে বাঘের ছাল পরে।
যাকে দেখাচ্ছে সে বললে—
ওরে চিনেছি তোকে, তুই আমাদের হরে'।
এ তখন চলে গেল হেসে—
আর একজনকে ভয় দেখাতে। (২৭৯)

জ্ঞানলোকে

অজ্ঞান ও জ্ঞান

সমাধি না হলে হয় না ঠিক জ্ঞান।
সমাধিতে তাঁর সঙ্গে এক।
ঠিক দুপুরবেলা সূর্য মাথার উপর,
তখন মানুষটার ছায়া নেই।
ঠিক জ্ঞান হলে—থাকে না অহং-ছায়া। (৩৮৬)

যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান, ঈশ্বরলাভ হয়নি,
ততক্ষণ জন্মগ্রহণ।
রোদে হাঁড়ি শুকোতে দেয় কুমোর,
পাকা হাঁড়ি, কাঁচা হাঁড়ি।
গরু-টরু চলে গেলে ভেঙে যায় কতক হাঁড়ি।
পাকা হাঁড়ি ভাঙলে ফেলে দেয় কুমোর,
তাদের দ্বারা হবে না কোনো কাজ।
কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে তাদের আবার লয়,
চাকেতে দিয়ে দেয় তাল পাকিয়ে,
আবার তৈরী হয় নতুন হাঁড়ি। (২৮৬)

কাঁটা গাছের মতো সংসার,
হাত দিলে রক্ত বেরোয়।
কাঁটাগাছ এনে যদি বসে-বসে বলো—
গাছ পুড়্ক, গাছ পুড়্ক,
গাছ কি পুড়ে যাবে?
জ্ঞানাগ্নি আহরণ করো,
আগুন লাগিয়ে দাও,
তবে তো পুড়বে। (৭৭৪)

বিষয়ী লোকেরও হতে পারে সমাধির অবস্থা।

আবার সে ভাব চলেও যায়।
সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে।
সূর্য যদি ঢাকা পড়ে মেঘে—
পদ্ম মুদিত।
বিষয়—মেঘ। (৬৫২)

বিষয়রস যার শুকিয়ে গেছে—
তার একটুকুতেই উদ্দীপন।
দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার ঘষো,
জ্বলবে না।
শুকিয়ে গেলে একটু ঘষলেই—
জ্বলে উঠবে দপ্ ক'রে। (৪৮৫)

আত্মাকে জানা যায়না
মনের দ্বারা।
আত্মাকে জানা যায়
আত্মার দ্বারা। (৮০২)

যারা অজ্ঞান তারা যেন আছে মাটির ঘরে।
ভিতরে তেমন আলো নাই,
বাহিরের কোনো জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না।
আর জ্ঞানলাভ করে যে থাকে সংসারে,
সে যেন আছে কাঁচের ঘরে,
ভিতরে আলো, বাহিরেও আলো,
ভিতরের জিনিস দ্যাখে,
দেখতে পায় বাহিরের জিনিসও। (৯০৩)

ঈশ্বর 'সেথা সেথা'—এই বোধ যতক্ষণ,
ততক্ষণ অজ্ঞান।
ঈশ্বর 'হেথা হেথা'—এই বোধ যখন,
তখন জ্ঞান।

একজন তামাক খাবে,
অনেক রাতে প্রতিবেশীর ঘরে গেল টিকে ধরাতে।
বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পরে দরজা খুলল প্রতিবেশী।
'কিগো, এত রাতে কী মনে ক'রে?'

'আর মনে করে!
জানো তো আমার তামাকের নেশা!
টিকে ধরাব।'
প্রতিবেশী বললে—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক,
এত কষ্ট ক'রে ঠেলাঠেলি করছ আমার দোর,
অথচ তোমার হাতেই আছে লণ্ঠনের আগুন।' (২৯৬, ৪৪৪)

যত সেয়ানাই হও—কাজলের ঘরে থাকলে
কালো দাগ লাগবেই, একটু না একটু।
তবে জ্ঞানীর গায়ে যে-দাগ লাগে সংসারের—
ক্ষতি হয় না তাতে।
কলঙ্ক আছে চন্দ্রে—
ব্যাঘাত হয় না আলোর। (১৬৮, ৯০৭, ৬৮৭)

খই যখন ভাজা হয়—
খোলা থেকে দু'চারটে খই লাফিয়ে পড়ে টপ্‌টপ্‌।
সেগুলি মল্লিকা ফুলের মতো,
গায়ে একটুও দাগ নেই।
খোলার উপরে যেসব খই থাকে—
সেও বেশ খই।
তবে ফুলের মতো নয়,
গায়ে একটু দাগ।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করে—
ঠিক মল্লিকা ফুলের মতো দাগশূন্য।
আর জ্ঞানের পরে সংসার-খোলায় থাকলে—
একটু লালচে দাগ। (১৬৮)

জ্ঞানলাভের পরে—
জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনই থাকে,
তবে কামাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায় কামাদি রিপু।
একবার বজ্রপাত হয়েছিল কালীবাড়িতে,
গিয়ে দেখলুম, কিছু হয়নি কপাটগুলির,
কেবল ইস্ক্রুগুলির মাথা গেছে ভেঙে।
কপাটগুলি যেন শরীর,
কামাদি আসক্তি—ইস্ক্রু। (৪৮৬)

দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখে মনে হয়—
পড়ে আছে গোটা দড়ি,
কাছে এসে ফু' দিলেই—
উড়ে যায়।
জ্ঞানীর শরীরে ক্রোধ আর অহঙ্কারের আকার—
তেমনি। (২৮৬, ৬২৫)

পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়।
লোহার তরোয়াল হয়ে যায় সোনার তরোয়াল।
তরোয়ালের আকার থাকে,
কিন্তু অনিষ্ট করে না।
মারা-কাটা চলে না সোনার তরোয়ালে। (১০০, ২০৬)

জ্ঞানোন্মাদ হলে আর থাকে না কর্তব্য।
তখন ভাববে না পরদিনের জন্য—
ভাববেন ঈশ্বর।
নাবালক ছেলে রেখে জমিদার যদি মরে যায়—
অছি ভার নেয় ত'র। (১২৩)

জ্ঞানের দুই লক্ষণ।
প্রথম—কূটস্থ বুদ্ধি।
হাজার দুঃখ-কষ্ট বা বিঘ্ন-বিপদ—
নির্বিকার।
কামারশালের নেহাই,
অবিরাম হাতুড়ি পিটছে—
নির্বিকার।
দ্বিতীয়—পুরুষকার, রোখ্।
কাম ক্রোধ অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ।
কচ্ছপ যদি ভিতরে হাত-পা সাঁধ করে তো—
চারখানা ক'রে কাটলেও বার করবে না। (৬৮৮)

বেদে আছে ব্রহ্মজ্ঞানীর নানা অবস্থার কথা।
আছে মনের সপ্ত ভূমির কথা।
মন যখন সংসারে—
তখন লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিতে মনের বাসস্থান—
মনের ঊর্ধ্বদৃষ্টি নেই।

এই তিন ভূমির উপর চতুর্থ ভূমি—হৃদয়।
তখন প্রথম-চৈতন্য, চারিদিকে জ্যোতি।
ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখে সাধক অবাক,
'এ কি! এ কি!'
মন যখন উঠেছে পঞ্চম ভূমিতে—
তখন ঈশ্বরীয় কথা ভিন্ন অন্য কিছু নেই,
ভিন্ন-কিছু বললে ভালোও লাগে না।
মনের ষষ্ঠভূমি কপাল—
সেখানে অহর্নিশ ঈশ্বরীয় রূপদর্শন।
তখনও একটু 'আমি' থাকে।
নিরুপম রূপদর্শনে উন্মত্ত সাধক,
ছুটে যায় রূপকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করতে।
পারে না।
লণ্ঠনের ভিতরে আলো,
এই আলো ছুঁলুম-ছুঁলুম—
কিন্তু কাঁচের ব্যবধান।
সপ্তম ভূমি-শিরোদেশ।
সেখানে মন গেলে সমাধি। বেহুঁশ।
খেতে পারে না কিছু, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়।
সে ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু। (৫০-৫১)

ব্রহ্মজ্ঞান যার হয়েছে সে বুঝতে পারে—
আত্মা আর দেহ আলাদা।
নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে
শাঁস আর খোল আলাদা।
ব্রহ্মজ্ঞান হলে আত্মাটি যেন
নড়বড় করে দেহের ভিতরে। (৫০৬, ১২৪)

সিদ্ধ ধান পুঁতলে কি হবে?
তাতে গাছ হয় না।
মানুষ জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ হলে—
তার দ্বারা হয় না নূতন সৃষ্টি।
সে মুক্ত হয়ে যায়। (২৮৬)

জ্ঞান হলে তাঁকে দেখায় না দূর,
তখন 'তিনি' আর 'তিনি' বোধ হয় না;

তখন হৃদয়মধ্যে 'ইনি'।
সকলের ভিতরে আছেন তিনি—
যে খোঁজে সে পায়। (১২২)

ছাত তো দেখা যায়,
কিন্তু ছাতে ওঠা বড় শক্ত।
তবে যদি কেউ উঠে থাকে—
দড়ি ফেলে সে আর একজনকে
নিতে পারে তুলে। (৬১৫)

জ্ঞানীর ধ্যান কি রকম জানো?
অনন্ত আকাশ,
তাতে পাখি উড়ছে আনন্দে,
পাখা বিস্তার ক'রে।
আত্মা পাখি,
উড়ছে চিদাকাশে,
আনন্দ ধরে না। (৫৯১)

কাজ শেষ হলে আর ফেরা নয়।
গৃহিণী সংসারের সমস্ত কাজ সেরে,
সকলকে খাইয়ে দাইয়ে,
দাস-দাসীদের পর্যন্ত খাইয়ে,
নাইতে যায়।
তখন ডাকাডাকি করলেও ফেরে না। (৭৯২)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

'অনেক' জানার নাম—
অজ্ঞান।
'এক' জানার নাম—
জ্ঞান।
তাঁর সঙ্গে আলাপের,
তাঁকে ভালবাসার নাম—
বিজ্ঞান। (৭৯২)

শুষ্ক জ্ঞান—
যেন ভক্ ক'রে ওঠা তুবড়ি,
খানিকটা ফুল কেটে ভেঙে যায়।
নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান ভালো তুবড়ি।
খানিক ফুল কেটে বন্ধ হয়,
আবার নতুন ফুল কাটে, বন্ধ হয়,
আবার ফুল কাটে।
নারদ শুকদেবাদির তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল।
প্রেম—সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি। (৭৪১)

বিজ্ঞান—কিনা বিশেষরূপে জ্ঞান।
কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে।
যে শুধু শুনেছে, সে অজ্ঞান,
যে দেখেছে, সে জ্ঞানী,
আর যে খেয়েছে, সে বিজ্ঞানী। (২৮৭)

যে জেনেছে কাঠে আছে নিশ্চিত আগুন,
সে জ্ঞানী।
কাঠ জেবলে রাঁধা, খাওয়া,
হেউ-ঢেউ হওয়া যার—
সে বিজ্ঞানী। (৪৭০)

যতক্ষণ দর্শন হয়নি বিচার ততক্ষণ।
ঘি যতক্ষণ কাঁচা ততক্ষণ কলকলানি।
পাকা ঘির শব্দ নেই।
তবে পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়লে—
ছ্যাঁক-কল্-কল্।
কাঁচা লুচিকে পাকা ক'রে আবার চুপ।
সমাধিস্থ হলে পুরুষ চুপ। (৪৯৭)

পরমহংসের স্বভাব পাঁচ বৎসরের বালকের মতো,
দ্যাখে সব চৈতন্যময়।
আমি তখন ওদেশে,
রামলালের ভাই শিবরাম চার-পাঁচ বৎসরের বালক,
পুকুরের ধারে যাচ্ছে ফড়িং ধরতে।
পাতা নড়ছে।

পাতাকে বলছে, চোপ্ ! আমি ফড়িং ধরবো।
ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে,
ঘরের মধ্যে বসে আছে আমার সঙ্গে,
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,
উঁকি মেরে এক-একবার দেখছে আর বলছে—
খুড়ো ! আবার চক্‌মকি ঠুকছে। (৭০৬)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করো,
তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও।
এক সাধু শহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্ছে।
অন্য আলাপী সাধুর সঙ্গে তার দেখা।
সে বললে, ঘুরে-ঘুরে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছ—
তোমার তল্‌পী-তল্‌পা কই ? চুরি যায়নি তো ?
এ সাধু বললে, না মহারাজ, আগে বাসা পাকড়েছি।
গাঁঠরি-গাঁঠরা ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে,
তবে বেড়াচ্ছি, শহরের রং দেখে। (৫৪৫)

অনেকক্ষণ থাকা যায় না—ভাবে।
আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখলে
লোকে মনে করবে—
পাগল। (১৩৫)

যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে
ততক্ষণ ভন্‌ভন্।
ফুলে মধুপান আরম্ভ করলে—
চুপ।
মধুপানের পর মাতাল।
তখন আবার—
কখনো কখনো-বা গুন্‌গুন্। (৪১৭)

লিপ্ত—নির্লিপ্ত

কচ্ছপ জলে চরে
কিন্তু মন পড়ে থাকে আড়ায়,
যেখানে তার ডিমগুলি।

সর্ব কর্ম করবে সংসারে—
কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। (১৮, ৬৯২)

পাঁকাল মাছের মতো থাকবে সংসারে।
পাঁক আছে,
থাকতে হয় পাঁকের ভিতর,
তবু পাঁকালের গায়ে লাগেনা পাঁক।
তেমনি সংসারে থাকো অনাসক্ত। (২৭৯)

সংসারে থাকবে নষ্ট স্ত্রীর মতো।
নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ করে,
কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির উপরে।
সংসার করো—
কিন্তু সর্বদা মন রাখো ঈশ্বরে। (৪৮১, ২০২)

সংসারে থাকবে, যেমন বড় মানুষের ঝি।
সে বাড়ির কাজ করে, মানুষ করে বাবুর ছেলে,
বাবুর ছেলেকে বলে, আমার রাম, আমার হরি,
কিন্তু বেশ জানে এ-বাড়ি আমার নয়,
এ ছেলেও নয় আমার।
সব কাজের মধ্যে মন পড়ে থাকে দেশে। (১৮, ৩১২-১৩)

পিঁপড়ের মতো থাকো সংসারে।
বালিতে মেশানো চিনি, পিঁপড়ে চিনিটুকু নেবে।
সংসারে মিশিয়ে আছে নিত্য ও অনিত্য,
চিদানন্দরস আর বিষয়রস,
জলে দুধে একসঙ্গে।
হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।
পানকৌড়ির মতো, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।
গোলমালে মাল আছে,
গোল ছেড়ে মালটি নেবে। (১১৬)

ঝড়ের এঁটো-পাতা হও—
সংসারে।
হাওয়াতে যেদিকে লয়ে যায়—
যাও।

কখনো ভালোয় কখনো মন্দে।
সমস্ত সমর্পণ করো তাঁকে। (১৩৯, ৬৪৭)

কর্ম কতদিন ?
যতদিন না তাঁকে লাভ করা যায়।
ফল দেখা দিলে ফুল যায়।
ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য। (৪৫৬)

তাঁর উপর যত ভালবাসা আসবে—
কমে যাবে কর্ম।
গৃহস্থ-বউয়ের পেটে ছেলে হলে,
শাশুড়ি কর্ম দেয় কমিয়ে।
যত মাস যায় আরও কর্ম কমায়।
দশ মাস হলে কর্ম নয় আদপে,
পাছে হানি হয় ছেলের।
তারপর ছেলে হলে—
বউ কেবল নাড়াচাড়া করে ঐটিকে নিয়ে,
অন্য কর্ম নয়। (৪২২-২৩, ১০৯)

বেশি কাজ জড়ানো ভালো নয়,
ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়।
কালীঘাটে গিয়ে দানই করতে লাগল—
কালীদর্শন আর হল না। (৪২)

ওদেশে ছুতোর-ঘরের মেয়েদের দেখেছি—
ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটে।
এক হাতে ধান নাড়ে, অন্য হাতে মাই দেয় ছেলেকে,
আবার খরিদ্দারের সঙ্গে কথাও কয়—
'তোমার কাছে দু'আনা পাওনা, দিয়ে যেও।'
তার কিন্তু বারো আনা মন হাতের উপর—
পাছে ঢেঁকি পড়ে হাতে। (৭৪০)

সাধনের সময়ে, এই সংসার—
'ধোঁকার টাটি।'
জ্ঞানলাভের পরে, তাঁকে দর্শনের পরে—
এই সংসার—
'মজার কুটি।' (৯৩৬)

ভাবলোকে

ভক্তিপথ—তোমাদের পথ,
সহজ পথ।
অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়?
জানবারই বা দরকার কি?
দুর্লভ মানবজনম পেয়ে আমার দরকার—
তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি।
একঘটি জলে তৃষ্ণা যায় আমার,
পুকুরে কত জল আছে মাপবার কী প্রয়োজন?
আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই,
শুঁড়ির দোকানে মদ কত—তার হিসাবে হবে কী?
বাগানে এসেছ আম খেতে।
কী হবে জেনে—বাগানে কত গাছ, কত ডাল?
খেয়ে যাও। (৫০, ১০৮, ৮৭৯)

কিছু চাওনা অথচ ভালবাসো—
তার নাম অহৈতুকী ভক্তি। (৭৮৪)

নিত্যকৃষ্ণ, আর তাঁর নিত্যভক্ত।
চিন্ময় শ্যাম আর তাঁর চিন্ময় ধাম।
চন্দ্র যেখানে—তারাগণও সেখানে। (৫৮৪)

ভক্তির বীজ যায় না।
আলেখ-লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়—
এইটি জেনে রেখো।
ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ—
ক্রমে গাছ, ফুল, ফল। (৫৪৯)

ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য।
কখনো না কখনো ফল হবেই।
বাড়ির কার্নিসে কেউ বীজ রেখে গিয়েছিল—
অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হলে
সেই বীজ পড়ল মাটিতে,
গাছ হল, ফল হল। (৪৬)

ভক্তি মেয়ে-মানুষ,
যেতে পারে অন্তঃপুর পর্যন্ত।
জ্ঞান—পুরুষ,
বারবাড়ি পর্যন্ত গতি। (১৬৯, ৫০৬)

সব মতকে নমস্কার করবে,
কিন্তু প্রাণঢালা ভালবাসা একটির উপর।
তারই নাম নিষ্ঠা।
বাড়ির বউ—
দেওর, শ্বশুরকে পা ধোয়ার জল দেয়,
আসন দেয়, সেবা করে।
কিন্তু পতিকে তার যেরূপ সেবা—
সে অন্য কাউকে নয়।
পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। (৪৬০-৪৬১)

তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।
রাজাকে দেখেছে কেউ-কেউ,
কিন্তু তাঁকে বাড়িতে আনতে পারে দু'একজনই,
পারে খাওয়াতে-দাওয়াতে। (৮০২)

মালিককে খোঁজা, আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা—
এইটেই কাজ।
ঈশ্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। (৯১৩)

ভক্তিলাভ ক'রে কর্ম করা যায়।
শুধু হাতে কাঁঠাল ভাঙলে—
আঠা লাগে।
তেল মেখে ভাঙলে—
লাগে না। (১০৮২)

বেশি বিচার করলে সব গুলিয়ে যায়।
উপর-উপর পুকুরের জল খাও—
বেশ পরিষ্কার।
বেশি নীচে হাত দিয়ে নাড়ালে—
ঘুলিয়ে যায়।
তাঁর কাছে প্রার্থনা করো ভক্তি। (৮৯৯)

ওগো চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে,
তেমনি তিনি টানতেই আছেন আমাদের।
লোহার গায়ে কাদা থাকলে লাগে না টান।
কাঁদতে-কাঁদতে যেমনি ধুয়ে যায় কাদাটুকু—
অমনি ধরে টান। (১০২৭)

পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের শব্দও
তিনি যে শুনতে পান। (৫৯২)

শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন

নামকীর্তন অভ্যাস করতে হয়।
নইলে যখন আসবে মৃত্যু—
তখন মনে জাগবে শুধু সংসারচিন্তা।
বিড়ালে ধরলে ক্যাঁ-ক্যাঁ বুলি পাখির—
তখন আর 'রাম-রাম', 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' নয়। (৯৩৬)

দেহ-বৃক্ষে পাপ-পক্ষী।
তাঁর নাম-কীর্তন যেন হাত-তালি।
হাত-তালিতে পাখি পালায়।
পাপ পালায় নাম-কীর্তনে! (৮৮৬)

তীর্থযাত্রা, গলায় মালা, আচার বিচার,
এসব প্রথম-প্রথম।
বস্তুলাভ হলে বাইরের আড়ম্বর যায় কমে।
তখন নামটি নিয়ে থাকা,
আর স্মরণ মনন।

ষোল টাকায় এক কাঁড়ি পয়সা।
ষোল টাকা একত্র করলে অত দেখায় না।
তাকে বদলে মোহর করলে—
আরও কম হয়ে যায়।
সেটি বদলে হীরা করো—
লোকে টেরই পাবে না। (৯৩১)

প্রেমপ্রবাহ

শ্রীমতী বলছেন—
সখি, চতুর্দিক দেখছি কৃষ্ণময়।
সখীরা বললেন—
অনুরাগ-অঞ্জন দিয়েছ চোখে,
তাই দেখছ অমন। (৬৫, ২৩৩)

শ্রীমতী বললেন—
সখি, তোরা কৃষ্ণবিরহে কাঁদছিস কত।
কী কঠিন আমি, চক্ষে জল নেই একবিন্দু!
বৃন্দা বললেন, হৃদয়ে তোর জ্বলছে বিরহ-অগ্নি—
চোখের জল শুকিয়ে গেছে অগ্নিতাপে। (১৮৬)

গোপীদের কী ভালবাসা!
শ্রীমতী স্বহস্তে এঁকেছেন কৃষ্ণের চিত্র,
কিন্তু পা আঁকেন নি,
পাছে চলে যান মথুরায়। (৯০১)

খুব ভালবাসা এলে চারিদিক ঈশ্বরময়।
তখন বোধ হয়—
তিনিই আমি।
গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে লাগলেন—
আমিই কৃষ্ণ। (৪২৮-২৯)

কখনো-কখনো গোপীদের এমন গভীর ভাব—
টের পেত না কেউ।
সায়র-দিঘিতে হাতী নামলে

টের পাওয়া যায় না। (৯৬-৯৭)

ননদিনীর ভয়ে শ্রীমতী বললেন কৃষ্ণকে—
তুমি থাকো হৃদয়-ভিতরে।
পরে ব্যাকুল হয়ে যখন কৃষ্ণকে দেখতে চাইলেন,
বিল্লীতে যেমন আঁচড়ায় তেমনি ব্যাকুলতা—
তখন কিন্তু কৃষ্ণ আর বেরোন না! (৬০৯)

ঈশ্বর-অনুভব না হলে মহাভাব হয় না।
গভীর জল থেকে মাছ উঠে এলে
জল নড়ে।
তেমন মাছ হলে জল তোলপাড়।

শ্রীমতীর মহাভাব হত!
সখীরা কেউ ছুঁতে গেলে অন্য সখীরা বলতেন,
ওরে, কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ, ছুঁসনি।
এঁর দেহমধ্যে এখন বিলাস করছেন কৃষ্ণ। (১০৫)

প্রেম কি সামান্য জিনিস গা?
প্রেমের দুই লক্ষণ—
প্রথম, ভুল হয়ে যাবে জগৎ,
ঈশ্বরেতে এত ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য।
চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভেবেছেন,
সমুদ্র দেখে যমুনা।
দ্বিতীয় লক্ষণ—
যে-দেহ নিজের এত প্রিয় তাতে থাকবে না মমতা,
দেহাত্মবোধ চলে যাবে একেবারে। (২২৯)

গোপীদের কি অনুরাগ,
তমাল দেখে প্রেমোন্মাদ। (৯৬-৯৭)

যদি প্রেমোন্মাদ হয়—
তখন কে বাপ! কে মা! কে স্ত্রী!
ঈশ্বরের জন্য যে পাগল—তার কর্তব্য নাই, ঋণ নাই।
প্রেমোন্মাদে জগৎ ভুল।
চৈতন্যদেবের হয়েছিল।

সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন—বোধ নাই সাগর বলে।
মাটিতে পড়ছেন বারবার আছাড় খেয়ে—
ক্ষুধা নাই—তৃষ্ণা নাই—নিদ্রা নাই—। (২৯৫)

ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল।
আগে নদী থেকে সমুদ্রে আসতে হত
এঁকে বেঁকে ঘুরে।
কিন্তু বন্যে এলে ডাঙার উপর দিয়ে
নৌকা সোজা চালিয়ে দিলেই হল। (৬৮, ২৬৭)

তুমি যে-পথেই থাকো, সাকারে বিশ্বাস বা নিরাকারে,
তাঁতে অনুরাগ থাকলেই হল,
তখন তিনি নিজেই জানিয়ে দেবেন।
যদি পাগল হতে হয়,
সংসারের জিনিস লয়ে কেন পাগল হবে ?
পাগল হও ঈশ্বরের জন্য। (৯৬-৯৭)

শরণাগত হও।
ত্যাগ করো লজ্জা আর ভয়।
লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়।
পাশবদ্ধ জীব—পাশমুক্ত শিব।
ভগবানের প্রেম দুর্লভ জিনিস।
স্ত্রীর স্বামীতে যেমন নিষ্ঠা,
সে নিষ্ঠা ঈশ্বরে হলে ভক্তি আসে,
ভক্তিতে প্রাণ লীন হয় ঈশ্বরে।
তারপর ভাব।
ভাবেতে মানুষ অবাক।
বায়ু তখন স্থির ;
বন্দুকে গুলি ছোঁড়ার সময়ে যেমন মানুষ—
বাক্যশূন্য, স্থির।
তারপর প্রেম—প্রেম অনেক দূরের কথা।
জগৎ ভুল হয়ে যায় প্রেমে। (৮৬)

যাদের রাগভক্তি আছে তারা একথা বলে না—
এই তো এত হবিষ্যি করলাম, তাতে হল কী ?
নতুন চাষা ফসল না হলে জমি ছেড়ে দেয়।

ফসল হোক আর না হোক
খানদানী চাষা কিন্তু চাষ করবেই।
তাদের বাপ-পিতামহ চাষ করে এসেছে,
তারা জানে খেতে হবে চাষ করেই। (৪৮৭)

যার ভিতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়—
ঈশ্বরলাভের দেরী নেই তার।
বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা,
ঈশ্বরের গুণকীর্তন, সত্য কথা—
এইসব অনুরাগের ঐশ্বর্য।
খানসামার বাড়ির চেহারা দেখলে বোঝা যায়—
বাবু খানসামার বাড়ি যাবেন, ঠিক হয়েছে।
প্রথমে বনজঙ্গল কাটা, ঝুলঝাড়া, ঝাঁটপাট ;
তারপর বাবু নিজেই পাঠিয়ে দিলেন—
সতরঞ্চ গুড়গুড়ি আরও পাঁচরকম জিনিসপত্র।
সেইসব আসতে দেখলেই লোকের বুঝতে বাকি থাকে না,
বাবু এসে পড়লেন বলে। (২৩০)

ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমভক্তি হয় না।
তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ উপস্থিত।
একজন বললে, ভাই, মারা গেলুম।
অন্যজন বললে, মারা যাব কেন,
এসো ঈশ্বরকে ডাকি।
বাকিজন বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে,
চলো, গাছে উঠে পড়ি।
যে-বললে মারা গেলুম, সে অজ্ঞান,
জানে না, ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন।
যে-বললে এসো ঈশ্বরকে ডাকি—সে জ্ঞানী।
আর যে বললে, তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে,
তার মধ্যে জন্মেছে প্রেম।
প্রেমিকের স্বভাব—সে নিজেকে বড় মনে করে,
প্রেমের পাত্রকে ছোট।
যাকে ভালবাসে—
তার পায়ে যেন কাঁটাটি না ফোটে,
এই তার বাসনা। (২৪৫)

প্রেমিক ভক্ত তাঁকে সম্ভোগ করে নানা রূপে।
কখনো মনে করে—তুমি পদ্ম, আমি অলি।
কখনো—তুমি সচ্চিদানন্দ, আমি মীন।
সে ভাবে—আমি তোমার নৃত্যকী।
নৃত্যগীত করে তাঁর সম্মুখে।
কখনো সখীভাব, দাসীভাব, বাৎসল্যভাব।
কখনো-বা মধুরভাব—
যেমন গোপীদের। (৭৭৯)

পূজার চেয়ে জপ বড়,
জপের চেয়ে ধ্যান বড়,
ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়
ভাবের চেয়ে মহাভাব, প্রেম বড়।
চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। (৭৭৯)

ভক্তহৃদয়

যেখানে মনের লয়—তাই সমাধি।
জ্ঞানীর হয় জড়সমাধি,
'আমি' থাকে না।
ভক্তিযোগে চেতনসমাধি।
তাতে থাকে সেব্য-সেবকের আমি,
রস-রসিকের আমি,
আস্বাদ্য-আস্বাদকের আমি। (৪৭২)

জ্ঞানীরা দেখে সব স্বপ্নবৎ।
ভক্তেরা সব অবস্থা লয়।
জ্ঞানী দুধ দেয়—ছিড়িক্-ছিড়িক্।
এক-একটা গরু খায় বেছে-বেছে,
তার দুধ ছিড়িক্-ছিড়িক্।
যারা অত বাছে না, সব খায়,
তারা দুধ দেয় হুড়্-হুড়্।
উত্তম ভক্ত নিত্য ও লীলা, দুইই লয়।
নিত্য থেকে মন নেমে এলেও
সম্ভোগ করতে পারে তাঁকে। (১৪৪)

ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়।
সে দ্যাখে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই।
মোমের বাগানে সবই মোম, তবে নানা রূপ
ভক্তি পাকা হলেই এরূপ বোধ হয়।
অনেক পিত্তি জমলে ন্যাবা লাগে—
তখন সব হলদে।
পারার হ্রদে অনেকদিন থাকলে—
সীসে পারা হয়ে যায়।
কুমুরে পোকা ভেবে-ভেবে আরশোলা নিশ্চল,
শেষে হয়ে যায় কুমুরে পোকা। (৯৭৯)

শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।
শুদ্ধজ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়—
শুদ্ধাভক্তিও সেখানে। (৮০)

সৎ কামনা রাখতে হয়—
তার চিন্তায় দেহত্যাগ হবে বলে।
সাধুরা চার ধামের এক ধাম বাকি রাখে।
অনেকে বাকি রাখে জগন্নাথক্ষেত্র—
তাহলে শরীর যাবে জগন্নাথের চিন্তায়। (৭৯৮)

দক্ষিণে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন চৈতন্যদেব।
একস্থানে দেখেন—একজন গীতা পড়ছে।
তা শুনে একটু দূরে বসে কেঁদে ভাসাচ্ছে একজন।
চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বুঝতে পারছ এসব ?
লোকটি বলল, ঠাকুর, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।
তবে কাঁদছ কেন ?
ভক্তটি বলল, আমি তো দেখছি অর্জুনের রথ,
ঠাকুর আর অর্জুন কথা কইছেন তাতে বসে।
তাই দেখে কাঁদছি। (৪১৯)

চিদানন্দ আরোপ করো, আনন্দ হবে।
কলকাতার বাড়ির দিকে যত এগোবে,
কাশী তত তফাত।
কাশীর দিকে যত যাবে,
কলকাতা তত দূর।

শ্রীমতী যত এগোচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দিকে
ততই পাচ্ছেন কৃষ্ণের দেহগন্ধ।
সাগরের দিকে নদী যত যায়—তত জোয়ার-ভাঁটা।
জ্ঞানীর ভিতর গঙ্গা বয় একটানা,
ভক্তের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা,
হাসে কাঁদে নাচে গায়।
ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিলাস করতে ভালবাসে,
সাঁতার দেয়, কখনো ডোবে, কখনো ওঠে,
জলের ভিতর বরফ—টাপুর-টুপুর, টাপুর-টুপুর। (৭৯)

যে-আলো দেখে ছুটে যায় ভক্ত—
সে আলো মণির।
মণির আলো উজ্জ্বল, কিন্তু স্নিগ্ধ শীতল।
তাতে গা পোড়ে না,
শান্তি হয়, আনন্দ। (১৭৩)

ভক্তের কাছে ঈশ্বর—
যেন সূর্যোদয়ের সূর্য,
সে সূর্যকে দেখা যায় অনায়াসে,
ঝলসে যায় না চোখ। (৪৪৮)

ভক্তের স্বভাব কি জানো?
আমি বলি, তুমি শোনো,
তুমি বলো, শুনি আমি। (৮৯৪)

ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের মতো।
তুমি একবার কলকেটা টানলে,
আমিও টানলুম একবার। (১০৭৬-৭৭)

গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে,
হয়ত কোলাকুলি করে তার সঙ্গে,
অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়।
গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে,
অপরকে গুঁতোয়। (১৮৪, ৪৮২)

ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন—

ভয় নেই তাদের।
মাঠে আলের উপর দিয়ে চলতে-চলতে
যে-ছেলে বাপকে ধরে,
সে যদি হাত ছেড়ে দেয় অন্যমনস্ক হয়ে—
পড়লেও পড়তে পারে।
কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে থাকে—
ছেলে পড়ে না। (৪৮৭)

ঠিক ভক্তের কোনো ভয়-ভাবনা নেই।
মা সব জানে।
বিড়াল ইঁদুরকে ধরে একরকম ক'রে,
নিজের ছানাকে অন্যরকমে। (৯০৯)

অধম ভক্ত বলে—
ঐ ঈশ্বর!
দেখিয়ে দেয় আকাশের দিকে।
মধ্যম ভক্ত বলে—
তিনি হৃদয়ে অন্তর্যামী।
উত্তম ভক্ত বলে—
এই যা-কিছু দেখছি
সবই তাঁর এক-একটি রূপ। (৪৬৩-৬৪)

ভক্তের ভিতর তিনি আছেন বিশেষ রূপে।
লাউয়ের ডোল ভালো হলে
তানপুরা ভালো হয়,
বেশ বাজে। (৭৮৪)

এক হিসাবে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়,
কেননা ভক্ত বয়ে নিয়ে বেড়ায়—
ভগবানকে। (১১৬)

কখনো ঈশ্বর চুম্বক,
ভক্ত ছুঁচ।
কখনো ভক্ত চুম্বক,

ভক্ত তাঁকে টেনে লয়।

তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন। (১১৬, ৯৪৪)

চির আশ্বাস

কাঁদো।
চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে।
নির্মল জলে দেখতে পাবে—
সূর্যের প্রতিবিম্ব। (১৩০)

ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয়।
তারপর সূর্য উঠবেই। (১৯, ২৮১)

যে বলে, আমার হবে না—
তার হয় না।
মুক্ত-অভিমানী মুক্তই হয়,
বদ্ধ-অভিমানী—বদ্ধ। (৯৮৫)

'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে হবে?
পুকুরের পাড়ে বসে থাকলে মাছ পাওয়া যায়?
চার করো।
তবে তো গভীর জল থেকে মাছ আসবে,
তবে তো জল নড়বে।
তখন আনন্দ।
হয়ত মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল,
কিংবা ধপাঙ্ ক'রে উঠল,
তারপর পুরো চেহারা,
তখন আরও আনন্দ। (১৩৭)

বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার।
তাঁর কখানা বাড়ি, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ,
তা জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন?
চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না,
কোম্পানির কাগজের খবর কি দিবে?
ধাক্কা খেয়েই হোক, আর বেড়া ডিঙিয়েই হোক—
যো-সো ক'রে বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ করো একবার,

তখন কত বাড়ি, কত বাগান, কোম্পানির কাগজ,
বলে দেবেন তিনিই।
আর বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে—
সেলাম করবে চাকর, দ্বারবান। (১৩৬, ৯৪৮)

ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখো,
মগ্ন হও তাঁর প্রেমে।
সব লোক বাগান দেখেই অবাক।
কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল,
বৈঠকখানা, ভিতরের ছবি—
দেখে অবাক।
বাগানের মালিককে খোঁজে কজন?
সত্য বলছি, ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে
তাঁর দর্শন হয়, আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে,
এই যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা কইছি।
সত্য বলছি।
একথা কারেই বা বলছি, কে-বা বিশ্বাস করে। (১১৯-২০)

আন্তরিক যে ঈশ্বরকে জানতে চাইবে—
তারই হবে—তার হবেই হবে।
যে-ব্যাকুল ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না—
তারই হবে—তার হবেই হবে। (৫৪৬)

অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।
যে-কোনো প্রকারে হোক, পড়লেই হল সাগরে।
মনে করো, একটি অমৃত-কুণ্ড আছে।
তার মধ্যে তুমি আস্তে-আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামো,
কি ঝাঁপ দিয়ে পড়ো,
কি কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিক,
অমৃতের আস্বাদনে তুমি হবেই অমর। (১১২)

ঝাঁপ দিলে—হবেই হবে।
ঝাঁপ দিলে—হবেই হবে। (৯১৩)

কি ভয়? তাঁকে ধরো!
কাঁটাবন হলই বা।

জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও।
কিসের ভয় ?
যে বুড়ি ছোঁয়, সে কি চোর হয় ?   (৩৭৭)

বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল।
বিশ্বাসের জোর কত, শুনেছ ?
সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্র—
তাঁকেও লঙ্কা যেতে—বাঁধতে হল সেতু !
কিন্তু রামনামে বিশ্বাস ক'রে
হনুমান লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল—
সমুদ্রের পারে।   (১৪)

মহাশক্তির রহস্য

কে তোমারে জানতে পারে

অনন্ত তাঁর ঐশ্বর্য,
কে তাঁকে ঠিক জানবে ?
আমার যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হল।
এক ঘটি জলেই চলে যায়,
পাতকুয়া-জলের কি দরকার ? (৯২, ৯২৫)

হারজিত তাঁর হাতে।
তাঁর কার্য বোঝা যায় না কিছু।
ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায়,
তবু ঠাণ্ডা-শক্তি।
পানিফল থাকে জলে—
কিন্তু গরম-গুণ।
মানুষের শরীর দ্যাখো—
যেটা মূল সেটা চলে গেল উপরে। (৭৬৮)

তিনি অনন্ত।
তাঁর পথও অনন্ত (৭২১)

তাঁর একটি কিরণে জগতে পড়েছে জ্ঞানের আলো,
তাই চিনতে পারছি পরস্পরকে।
সার্জন-সাহেব রাতের আঁধারে বেড়ান লণ্ঠন-হাতে,
কেউ দেখতে পায় না তাঁর মুখ,
তিনি কিন্তু দেখেন সকলেরই মুখ,
তাঁর হাতের আলোয় অন্যরাও দেখতে পায় পরস্পরকে।
সার্জনকে দেখতে হলে প্রার্থনা করতে হয়—
সাহেব, কৃপা ক'রে একবার আলোটি তুলে ধরো—
নিজের মুখের উপর। (৬৫)

সকলই তোমারি রূপ

তিনি আছেন তাই সব আছে।
তাঁকে বাদ দিলে থাকে না কিছুই।
এক-এর পিঠে শূন্য দিলে বেড়ে যায় সংখ্যা,
আর এক-কে মুছে ফেললে—
শূন্যের কোনো পদার্থই নেই। (৬২৫)

তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য।
এক একবার দেখি—
বর্ষায় পৃথিবী যেমন জরে থাকে,
জগৎ সেইরূপ জরে আছে চৈতন্যে। (৪৩৭)

অন্তরে আছেন তিনিই।
তাই বেদে বলে—তত্ত্বমসি।
বাইরেও তিনি।
তাঁর নানা রূপ—
মায়াতে। (৭৭৮)

তিনিই যেন মানুষ-শরীরটাকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন হেলে-দুলে।
ঢেউয়ের উপর ভাসছে বালিশ,
নড়তে-নড়তে চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক,
ঢেউ লেগে একবার উঁচু,
তারপরেই ঢেউয়ের সঙ্গে নামল নীচুতে। (৪৬৪)

সবই ঈশ্বরের শক্তি।
বড় পদ তিনিই দিয়েছেন, তাই হয়েছে।
লোকে মনে করে আমরা বড়লোক।
ছাতের জল পড়ে সিংহের মুখওলা নল দিয়ে।
মনে হয়, সিংহ-মুখের জল।
না।
মেঘ হয় আকাশে, সেই জল পড়ে ছাতে,
গড়িয়ে ঢোকে নলে,
তারপর বেরোয় সিংহের মুখ দিয়ে। (৮৭৯)

পরমাত্মা যেন চুম্বক-পাথর,

জীবাত্মা ছুঁচ।
তিনি টেনে নিলেই—
যোগ।
মাটিমাখা ছুঁচকে টানে না চুম্বক,
মাটি সাফ ক'রে দিলে—
টানে। (৬৪৬)

সকলেই তাঁকে জানতে পারবে,
উদ্ধার হবে সকলেই।
তবে কেউ খেতে পায় সকাল-সকাল,
কেউ দুপুরবেলা, কেউ-বা সন্ধ্যায়।
অভুক্ত থাকবে না কেউ।
সকলেই জানবে আপন স্বরূপ। (৫৭০)

আমি আর কি বলব?
চাঁদা মামা সকলেরই মামা,
তুমি বলো তাঁকে। (১২৮)

যদি আমায় কেউ গুরু বলে।
আমি বলি, দূর শালা, গুরু কিরে!
এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই।
উপায় নাই তিনি বিনা। (১২৮)

অন্য ঘড়ি যত ভুল হোক—
সূর্য ঠিক যাচ্ছে।
মিলিয়ে নিতে হয় সূর্যের সঙ্গে। (৫২৫)

আমার কাছে শুনে যাও এই পর্যন্ত।
যদি বেশি জানতে চাও একলা বলবে তাঁকে।
ছেলে ভিখারীকে দিতে পারে এক কুনকে চাল,
রেলভাড়া দিতে হলে জানাতে হয় বাবাকে। (৫৮৬)

বাপের পাঁচটি ছেলে।
দুই একজন ডাকতে পারে, 'বাবা' বলে।
বাকি কেউ ডাকে 'বা', কেউ ডাকে 'পা।'
যে বাবা বলে ডাকে—

তার উপর কি বাপের বেশি ভালবাসা—
যে 'পা' বলে তার চেয়ে ?
বাবা জানে, এরা কচি ছেলে,
ঠিক বাবা বলতে পারছে না। (৬৮৫)

ঠাকুরবাড়িতে এসেছিল কতকগুলি শিখ সিপাহী।
মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা।
একজন বললে, ঈশ্বর দয়াময়।
আমি বললাম, বটে, সত্য নাকি, জানলে কেমন করে ?
তারা বললে, কেন মহারাজ, তিনি খাওয়াচ্ছেন, যত্ন করছেন।
আমি বললাম, সে আর কি আশ্চর্য ?
ঈশ্বর যে সকলের বাপ,
বাপ ছেলেকে দেখবে না তো দেখবে কে ?
তাই বলে তাঁকে দয়াময় বলতে বারণ করছি না।
আমার বলবার মানে—
ঈশ্বর আপনার লোক, পর নন। (১১৪)

তিনি তো ধর্ম-মা নন, আপনারই মা।
ব্যাকুল হয়ে আবেদন করো মার কাছে।
ঘুড়ি কিনবার জন্য ছেলে মার আঁচল ধরে পয়সা চায়।
মা হয়ত গল্প করছেন মেয়েদের সঙ্গে,
প্রথমে দিতে চান না কিছুতে, বলেন—
'তিনি বারণ করেছেন', 'তিনি এলে বলে দিব',
'এক্ষুণি ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড করবি।'
ছেলে যখন কাঁদতে শুরু করে, ছাড়ে না কোনোমতে,
মা তখন অন্য মেয়েদের বলেন,
'রোসো, শান্ত ক'রে আসি ছেলেটাকে।'
এই বলে, চাবি নিয়ে কড়াৎ-কড়াৎ ক'রে বাক্স খুলে
পয়সা ফেলে দেন। (১২৪)

ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক,
অনন্তকালে আপনার। (১১৪, ৯৫২)

ঈশ্বরই বস্তু,
আর সব অবস্তু। (১০১)

ভালো মন্দ তুমি হে সকলি

তিনিই এক-এক রূপে বেড়াচ্ছেন।
কখনো সাধু, কখনো ছল, কখনো খল।
আমি তাই বলি—
সাধুরূপ নারায়ণ, ছলরূপ নারায়ণ
খলরূপ নারায়ণ, লুচ্চারূপ নারায়ণ। (২৮৮)

তিনি লীলা করছেন বিদ্যা ও অবিদ্যা-রূপে।
দুই-ই প্রণাম করি।
চণ্ডীতে আছে, তিনিই লক্ষ্মী,
আবার হতভাগাদের ঘরে অলক্ষ্মী। (৭৪৬)

তিনিই সব হয়েছেন।
তবে এক-এক জায়গায় বেশি প্রকাশ।
যেমন সাধুতে।
কোনো জল খাওয়া যায়, কোনো জলে নাওয়া,
কোনো জলে কেবল আঁচানো শোচানো,
আবার কোনো জলে পূজা। (৮৮৫-৮৬)

ধর্ম নিলেই লতে হবে অধর্ম,
পুণ্য নিলেই পাপ,
জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান,
শুচি নিলেই অশুচি।
যার আছে এক বোধ,
তার আছে অনেক বোধ।
ভাল বোধ থাকলে মন্দ বোধও থাকে। (২০১)

সকলই তোমারি ইচ্ছায়

লোকে বলে, শরীর নড়ছে!
নড়ছেন তিনিই—
জানে না।
লোকে বলে, জলে হাত পুড়ে গেল।
জলে পোড়ে না কিছু,

জলের ভিতরে যে-অগ্নি, পুড়ল তাতে—
জানে না।
হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, লাফাচ্ছে আলু বেগুন।
ওরা লাফাচ্ছে নীচে আগুন আছে বলেই—
জানে না।
মানুষ বলে, ইন্দ্রিয় কাজ করে আপনা-আপনি।
ভিতরে চৈতন্যস্বরূপ আছেন বলেই ইন্দ্রিয় সক্রিয়—
জানে না। (৫৯২)

বাজিকরের হাতে পুতুল বেশ নাচে,
হাত থেকে পড়ে গেলে নড়েচড়ে না।
ঈশ্বরই সব করছেন,
তিনি যন্ত্রী—অন্যরা যন্ত্র। (১৯৪-৯৫)

তিনি লীলাময়ী! এ সংসার তাঁর লীলা।
তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী।
তাঁর ইচ্ছা, তাই খেলা করেন।
বুড়িকে আগে ছুঁলে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না।
সবাই যদি ছুঁয়ে ফেলে—খেলা হয় কেমন ক'রে?
খেলা চললেই বুড়ির আনন্দ।
তিনি মনকে আঁখি ঠেরে, ইশারা ক'রে বলছেন—
যা, এখন সংসার করগে।
মনের কি দোষ! (৩৬)

তাঁর হাঁ-তে জগতের সব হয়,
তাঁর না-তে বন্ধ হয় সব হওয়া।
মানুষের পক্ষে তাই আশীর্বাদ করতে নাই।
মানুষের ইচ্ছাতে যে, হয় না কিছু,
হয়— যায়—তাঁর ইচ্ছাতে। (৫৫৪)

কি আশ্চর্য!
আমি মূর্খ, তবু লেখাপড়াওলারা আসে এখানে।
আশ্চর্য।
একেই বলতে হবে ঈশ্বরের খেলা। (৮৪০)

এ জগৎ মিথ্যা নয়

ব্রহ্ম অটল, অচল, সুমেরুবৎ।
কিন্তু যার আছে 'অচল'—
'চল'ও তার। (৪৬৭)

এক থেকেই অনেক,
নিত্য থেকে লীলা।
এমন অবস্থা হয় যে, 'অনেক' চলে যায়,
যায় 'এক'ও।
কেননা এক থাকলেই দুই। (৯৩৪)*

একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা।
লীলা ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই।
জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল।
হেলা-দোলা থেমে গেলেও—
সেই জল। (৮৩১, ৬৪৭)

সাপ চুপ ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ,
তির্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ।
বাবু যখন চুপ ক'রে আছেন তখনও যিনি,
যখন কাজ করছেন তখনও তিনি।
জীব-জগৎকে বাদ দেব কেমন ক'রে ?
তাহলে যে কম পড়বে ওজনে।
বেলের বিচি আর খোলা বাদ দিলে—
পাওয়া যায় না গোটা বেলের ওজন। (৬৪৫-৪৬)

আমি সবই লই।
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,
ব্রহ্মা, মায়া, জীব, জগৎ,
নিত্য, লীলা—
সবই লই।
মায়া বলে উড়িয়ে দিই না সংসারকে। (১৪৪)

যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য—
ততক্ষণ জগৎ সত্য,

ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপ সত্য,
ঈশ্বরের নানা রূপ সত্য। (৫০)

ভক্তের আমিতে দর্শন হয় সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তির।
যেকালে আমি-জলে প্রতিবিম্ব-সূর্য ছাড়া
সত্য-সূর্যকে দেখবার উপায় নেই—
সেকালে প্রতিবিম্ব-সূর্য ষোল আনা সত্য।
প্রতিবিম্ব-সূর্যই আদ্যাশক্তি।
ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও—
প্রতিবিম্ব-সূর্যকে ধরে এগিয়ে যাও সত্য-সূর্যের দিকে।
সগুণ ব্রহ্মকে প্রার্থনা করো—
তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন।
কেননা যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ,
পূর্ণ-জ্ঞানের পর অভেদ। (১৩১)

রাম জিজ্ঞাসা করলেন—
হনুমান, তুমি কিভাবে আমার অর্চনা করো?
হনুমান বললেন—
কখনো দেখি, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ,
কখনো, তুমি প্রভু, আমি দাস।
আর রাম, তত্ত্বজ্ঞান হয় যখন—তখন দেখি—
তুমিই আমি, আমিই তুমি। (৫৭৪)

শিবের দুই অবস্থা।
যখন আত্মারাম তখন সোঽহং,
যোগে মন স্থির।
যখন পার্থক্যবোধ থাকে—
তখন রাম রাম ক'রে নৃত্য। (৮১০)

সিঁড়ি ধরে উঠলে ছাতে।
যতক্ষণ তোমায় ছাত-বোধ আছে—
ততক্ষণ আছে সিঁড়ি।
যার আছে উঁচুবোধ—
তার আছে নীচুবোধ। (৬৪৭)

ছাতে অনেকক্ষণ থাকতে পারেনা লোকে।

সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—।
'নি'-তে থাকা যায় না অনেকক্ষণ।
সমাধিস্থ হয়ে যাঁরা ব্রহ্মদর্শন করেছেন,
নেমে এসে দেখেন তাঁরা—
তিনিই আমি,
তিনিই জীবজগৎ। (৪১৮)

ঘণ্টার শব্দ—
ট—অ—অ—ম্—ম্—।
লীলা থেকে নিত্যে লয়।
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়।
আবার ঘণ্টা বাজল,
যেন মহাসমুদ্রে গুরু জিনিস পড়ল,
আবার ঢেউ,
আরম্ভ হল—নিত্য থেকে লীলা। (১৪৪-৪৫)

মহাকাল—মহাকালী

আদ্যাশক্তি ও পরব্রহ্ম এক।
যেমন জ্যোতি আর মণি।
মণি ছেড়ে মণির জ্যোতি
ভাববার উপায় নেই। (২৬৭)

যিনি ব্রহ্ম—তিনিই কালী।
যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে বলি ব্রহ্ম।
স্থির জল—ব্রহ্মের উপমা।
যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, করেন—
তখন তাঁকে শক্তি কই।
জল হেলচে, দুলচে—
শক্তি বা কালীর উপমা। (১২৯১, ১৬২)

যোগমায়া।
অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির যোগ।
শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে।
শিব শব, কিন্তু তাকিয়ে কালীর দিকে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির মানেও তাই।
ঐ যোগের জন্য তাঁদের বঙ্কিম ভাব।
শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর,
কৃষ্ণের পীতবসন, শ্রীমতীর বসন নীল। (৭৪)

শক্তি না মানলে মিথ্যা হয়ে যায় জগৎ,
আমি তুমি, ঘর বাড়ি, পরিবার—সব মিথ্যা।
আদ্যাশক্তি আছেন বলে দাঁড়িয়ে আছে জগৎ।
কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না,
হয় না সুন্দর দুর্গা প্রতিমা। (৬২৩)

জগদ্ধাত্রী-রূপের মানে জানো?
জগৎকে যিনি ধারণ করে আছেন।
তিনি না ধরলে, পালন না করলে,
জগৎ যায় পড়ে।
মন-করীকে যে বশ করতে পারে—
জগদ্ধাত্রী উদয় হন হৃদয়ে তার। (৭৩)

দেহ ধারণ করলে মানতে হয় শক্তি।
জজসাহেবও যখন সাক্ষী দেন—
তাঁকে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়
সাক্ষীর মঞ্চে। (৭২০)

কন্যা শক্তিরূপা।
বিবাহের সময়ে দ্যাখো না—
বর বোকাটি, বসে আছে পিছনে,
কন্যা কিন্তু নিঃশঙ্ক। (৪৩০)

কালই ব্রহ্ম।
কালের সঙ্গে যিনি রমণ করেন—
তিনিই কালী।
অটলকে তিনি টলিয়ে দেন। (৬৬৯, ৭৭৬)

যার অটল আছে,
টলও তার। (৬৪৮)

যখন সৃষ্টি হয় নাই,
ছিল না চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী,
নিবিড় আঁধার,
তখন কেবল নিরাকারা মহাকালী—
মহাকালের সঙ্গে বিরাজিতা। (৩৫)

মৃত্যু আছেই।
প্রলয়ে সব ধ্বংস, থাকবে না কিছুই।
যখন নাশ হয় জগৎ, মহাপ্রলয়,
মা তখন লুকিয়ে রাখেন সৃষ্টির বীজ।
তিনি প্রসব করেন জগৎ,
আবার থাকেন জগতেরই মধ্যে। (৩৫০, ২৩৬)

কালী কি কালো?
দূরে তাই কালো।
জানতে পারলে কালো নয়।
আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ,
কাছে দ্যাখো, রঙ নাই।
সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল,
হাতে তুলে নাও—
রঙ নাই। (৩৫)

নিত্য সত্যের ভুবনে

জানিয়াছি সেই অবিনাশী

যতক্ষণ না পৌঁছানো যায় হাটে—
দূর হতে কেবল হো-হো শব্দ।
হাটে পৌঁছলে আর একরকম।
তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।
দূর হতে সমুদ্রের হো-হো,
কাছে গেলে—
কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখি উড়ছে,
ঢেউ উঠছে—পড়ছে। (১৩৬)

বিচার ক'রে জানা যায় একরকম।
ধ্যান ক'রে আর একরকম,
আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন—
সে অন্য রকম।
যেমন অন্ধকারে দেশলাই ঘষতে-ঘষতে
দপ্ ক'রে—আলো।
দপ্ করে যদি আলো দেন—
মিটে যায় সব সন্দেহ। (১৬২)

চৈতন্য দর্শন কিরূপ?
এক-একবার চিনে-দেশলাই জে্বলে
অন্ধকার ঘরে যেমন হঠাৎ আলো। (৯৩৪)

ঈশ্বরদর্শন হলে—
জ্যোতি দেখা যায়—আনন্দ।
বুকের ভিতর গুর্ গুর্ ক'রে
মহাবায়ু ওঠে—তুবড়ির মতো। (৮৮৪)

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে
হঠাৎ এলো আলো।
অন্ধকার কি যায় একটু-একটু ক'রে,
না, পালিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ? (৩৪৮)

তাঁকে রাত্রিদিন চিন্তা করলে—
তাঁকে দেখা যায় চারিদিকে।
প্রদীপের শিখার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে
খানিক পরে—
চারিদিক শিখাময়। (৪২৯)

ঠিক ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ আছে।
একটি লক্ষণ—আনন্দ।
যেমন সমুদ্র—
উপরে হিল্লোল কল্লোল,
নীচে গভীর জল।
যার ঈশ্বরদর্শন হয়েছে—
সে কখনো পাগলের ন্যায় অথবা পিশাচের ন্যায়—
শুচি-অশুচির ভেদ নাই।
বালকের ন্যায়—
আঁট নাই ; কাপড়-বগলে বেড়ায়।
কখনো যুবার ভাব—
সিংহতুল্য—যখন কর্ম করে বা লোকশিক্ষা দেয়।
আবার কখনো জড়ের ন্যায়—
কেননা অন্তর বাহিরে ঈশ্বরদর্শন ক'রে—
অবাক। (১০০, ৪৯৪)

ঈশ্বর বালকস্বভাব।
ছোট ছেলে, বসে আছে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে।
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে লোক, রত্ন চাইছে অনেকে,
কাপড়ে হাত চেপে ছেলে বলছে, মুখ ফিরিয়ে,
আমি দেবো না, আমি দেবো না।
আবার হয়ত যে চায়নি, চলেই যাচ্ছে,
দৌড়ে গেল তার পিছনে,
দিয়ে এল। (৫৩৮-৩৯)

যার ঈশ্বরলাভ হয়েছে সে বালকস্বভাব,
বশ নয় কোনো গুণের।
এইমাত্র ঝগড়া মারামারি করলে কারো সঙ্গে,
পরক্ষণে তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা।
এই খেলাঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত,
কিছু পরে সব পড়ে রইল, ছুটছে মার কাছে।
হয়ত বেড়াচ্ছে সুন্দর কাপড় পরে,
খানিক পরে কাপড় খুলে গেছে, নয় বগলদাবা।
ছেলেটিকে যদি বলো, বেশ কাপড়—কার রে ?
সে বলবে, আমার কাপড়, বাবা দিয়েছে।
যদি বলো, লক্ষ্মী ছেলে, দাওনা আমায় !
সে বলবে, না, বাবা দিয়েছে, আমি দেব না।
তাকে ভুলিয়ে একটা পুতুল কি বাঁশি দাও,
সে অমনি কাপড়খানা দিয়ে চলে যাবে।
পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে তার কত ভালবাসা,
কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যদি অন্য জায়গায় চলে গেল—
তখন সঙ্গী হল নতুন খেলুড়ে,
সব ভালবাসা গিয়ে পড়ল তার উপর।
জাত অভিমান নাই।
মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়,
তা ষোলআনা জানে, ও আমার ঠিক দাদা। (১৭১-৭৩)

সাধনার জন্যই শরীর।
স্বর্ণপ্রতিমা যতক্ষণ না ঢালাই হয়—
ততক্ষণ দরকার মাটির ছাঁচের
প্রতিমা হয়ে গেলে ফেলে দেওয়া যায় ছাঁচ।
ঈশ্বরদর্শন হলে—ত্যাগ করা যায় শরীর। (৭৩৮)

ভগবানকে দর্শনের পরে অনেকটা নির্ভয়।
ছাতে একবার উঠতে পারলে ছাতে নাচাও যায়।
সিঁড়িতে যায় না নাচা।
আবার, যা ত্যাগ ক'রে ছাতে গেছি,
ছাদে উঠে তা ত্যাগ করতেও হয় না।
ইঁট চুন সুরকীতে তৈয়ারী ছাত—
সিঁড়িও তাই।
যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান,

ভগবান দর্শনের পরে সেই মেয়েমানুষ—
সাক্ষাৎ ভগবতী। (৩৩৬)

যিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন তিনি দেখেন—
ঈশ্বরই জীবজগৎ হয়ে আছেন,
সবই তিনি। (৪৯৬)

তাঁকে লাভ করলে জানা যায়—
তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট,
তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,
তিনিই জীবজগৎ। (৫৪৯)

বাক্যমনাতীত

মুখে বলা যায় না ব্রহ্মের স্বরূপ।
অনন্তকে কে বোঝাবে মুখে!
পাখি যত উপরে ওঠে—
তার উপরেও উপর আছে। (৮৯২)

উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে সব কিছু—
বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়্‌দর্শন ;
হয়নি একটি জিনিস—ব্রহ্ম।
ব্রহ্ম কি—বলতে পারেনি কেউ
আজ পর্যন্ত। (৪১৬)

পঞ্চভূত লয়ে যে-দেহ সেটি স্থূল।
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আর চিত্ত—
এই লয়ে সূক্ষ্মশরীর।
যে-শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয়,
হয় ঈশ্বর সম্ভোগ,
সেইটি কারণ-শরীর।
তন্ত্রে বলে, ভাগবতী তনু।
সকলের অতীত হল মহাকারণ—
তা কী, বলা যায় না মুখে। (২০১)

কি ক'রে বোঝাব—ব্রহ্মদর্শন কী ?
একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল তার সঙ্গী,
তোর তো স্বামী এসেছে,
আচ্ছা ভাই, স্বামী এলে তোর কিরূপ আনন্দ হয় ?
মেয়েটি বললে,
তোর যখন স্বামী হবে তখন বুঝবি তুই,
এখন বোঝাই কেমন ক'রে ? (১৯৯)

সব কথা বোঝানো শক্ত।
কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—
ঘি খেতে কেমন ?
উত্তর—
কেমন ঘি না যেমন ঘি। (৭৪২)

ব্রহ্ম বাক্য-মনের অতীত।
যে যত বড় হোক না কেন—তাঁকে কি জানবে !
শুকদেবাদি না-হয় ডেঁয়ো পিঁপড়ে—
চিনির আট-দশটা না-হয় মুখে করুক !
একজন এল সাগর দেখে।
কেমন দেখলে ?—
তাকে জিজ্ঞাসা করল কেউ।
সে বলল হাঁ ক'রে—
ও ! কি দেখলুম ! কি হিল্লোল ! কি কল্লোল ! (৪১৬)

লুনের পুতুল গিছল সমুদ্র মাপতে।
সমুদ্রে যাই নেমেছে,
অমনি গলে মিশে গেল !
কে খবর দিবে ? (৪৮, ৪১৭)

চার বন্ধু ভ্রমণে বেরিয়ে দেখতে পেল পাঁচিল-ঘেরা জায়গা।
খুব উঁচু পাঁচিল।
পাঁচিল বেয়ে উঠল একজন,
ওপারে উঁকি মেরে অবাক হয়ে গেল,
এত অবাক যে, হা-হা-হা-হা বলে পড়ে গেল ভিতরে,
কী দেখলে খবর দিলে না।
যেই উঠে সে-ই হা-হা-হা-হা ক'রে পড়ে যায়।
কে আর খবর দেবে ! (৭১)

সন্ধ্যার পর জোনাকি ওঠে,
সে মনে করে, জগৎকে আলো দিচ্ছি আমি।
যেই নক্ষত্র ওঠে, চলে যায় জোনাকির অভিমান।
নক্ষত্ররা ভাবে, আমরাই আলো দিই জগৎকে।
চন্দ্র উঠলেই নক্ষত্ররা লজ্জায় মলিন।
চন্দ্র মনে করল, জগৎ হাসছে আমার আলোয়।
দেখতে দেখতে অরুণ উদয়,
মলিন হয়ে গেল চাঁদ,
খানিক পরে আর দেখাই গেল না। (৮৭)

সন্ধ্যাদি কর্ম কতদিন ?
যতদিন না ঈশ্বরের নামে অশ্রু আর পুলক।
একবার ওঁ বললে যদি চোখে জল আসে,
নিশ্চয় জেনো, তোমার কর্ম শেষ।
তখন সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয়,
গায়ত্রী প্রণবে লয়।
যেমন ঘণ্টার শব্দ—টং—ট—অ—ম্—!
নাদ ভেদ ক'রে যোগী পরব্রহ্মে লয়। (১০৯-১০)

শব্দ ব্রহ্ম।
নাভি থেকে আপনি উঠছে ঐ অনাহত শব্দ।
শুধু শব্দ শুনলে কি হবে ?
দূর থেকে শোনা যায় শব্দকল্লোল,
কল্লোল ধরে এগোলে পৌঁছানো যায় সমুদ্রে।
অনাহত ধ্বনি ধরে এগোলে—
যাওয়া যায় তার প্রতিপাদ্য—ব্রহ্মে।
তাকেই বলেছে পরমপদ। (৯৫৫)

সর্বদাই হচ্ছে অনাহত ধ্বনি,
ধ্বনি প্রণবের, আসছে পরব্রহ্ম থেকে,
শুনতে পান যোগীরা।
সে ধ্বনি ওঠে একদিকে যোগীদের নাভি থেকে,
অন্যদিকে ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে। (২৮৫)

পাখী জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল অন্যমনস্ক হয়ে !
জাহাজ ছিল গঙ্গার ভিতরে, ক্রমে এসে পড়ল মহাসমুদ্রে।
পাখির চটকা ভাঙল, দেখলে কূলকিনারা নেই কোথাও।
ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উড়ে গেল উত্তরদিকে।
অনেক দূরে গিয়ে শ্রান্ত, তবু পেলনা কিনারা।
ফিরে এসে বসল মাস্তুলে।
অনেকক্ষণ পরে উড়ে গেল আবার,
এবার পূর্ব দিকে।
সেদিকেও দেখতে পেলনা কিছুই,
চারিদিকে কেবল অকূল পাথার।
পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এলো মাস্তুলে।
জিরিয়ে এবার গেল দক্ষিণে,
সেইরূপে পশ্চিমে।
যখন দেখল কোথাও নেই কূলকিনারা—
তখন সেই-যে মাস্তুলে এসে বসল
আর উঠল না। (৫৬৩-৬৪)

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি

ব্রহ্মজ্ঞান হলে গুরু-শিষ্যে থাকে না পার্থক্যবোধ।
'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।'
জনক বললেন শুকদেবকে,
যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও, আগে দক্ষিণা দাও।
ব্রহ্মজ্ঞান হলে তো গুরু-শিষ্যে থাকবে না ভেদবুদ্ধি। (৮৯১

তত্ত্ব মানে—আত্মজ্ঞান।
তৎ মানে পরমাত্মা,
ত্বং মানে জীবাত্মা।
জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক হলে—
তত্ত্বজ্ঞান। (৭৮৩)

বাজিকর আর তার বাজি।
সবাই অবাক বাজি দেখে।
কিন্তু মিথ্যা সবই।
সত্য কেবল বাজিকর। (৯৫১)

শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয় !
তিনি যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সাক্ষী—
তখনই তাঁকে বলি ঈশ্বর ।
অনেক দূরে চুম্বক পাথর—
কিন্তু ছুঁচ নড়ছে ।
চুম্বক পাথর চুপ, নিষ্ক্রিয় । (১৪৭)

শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত ।
বিদ্যা অবিদ্যা—তাঁতে দুইই আছে ।
বায়ুতে কখনো সুগন্ধ, কখনো দুর্গন্ধ ।
বায়ু নির্লিপ্ত । (৫০৬)

আগুনে নীল বড়ি দাও—নীল শিখা ।
লাল বড়ি দাও—লাল শিখা ।
আগুনের আপনার রঙ নাই ।
শুদ্ধ আত্মাই স্বরূপ আমাদের ।
এই স্ব-স্বরূপকে জানা, তাঁতে মন রাখা—
তাকেই বলে জ্ঞান । (৭৭২-৭৩)

সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য—
এসব অপকার করতে পারে না আত্মার ।
তবে কষ্ট দিতে পারে দেহাভিমানীকে ।
ধোঁয়া ময়লা করে দেওয়াল,
আকাশের করতে পারে না কিছুই । (৭৫)

ব্রহ্ম নির্লিপ্ত ।
ভালো-মন্দ, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে ।
যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ পড়ছে ভাগবত,
কেউ করছে উইল জাল ।
প্রদীপ নির্লিপ্ত ।
সূর্য আলো দিচ্ছে শিষ্টের উপর, দিচ্ছে দুষ্টের উপরও ।
যদি বলো দুঃখ তাপ অশান্তি—এ সকল তবে কি ?
তার উত্তর, ওসব জীবের পক্ষে ।
ব্রহ্ম নির্লিপ্ত ।
সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়,
কিন্তু সাপের হয় না কিছুই । (৪১৫-১৬)

বেদান্তবাদী সাধু কেবল বিচার করে—
ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।
বড় কঠিন পথ।
জগৎ মিথ্যা হলে যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা,
তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ।
বড় দূরের কথা।
যেমন, কর্পূর পোড়ালে থাকে না কিছুই।
কাঠ পোড়ালে তবু থাকে ছাই।
শেষ বিচারের পর সমাধি।
তখন আমি, তুমি, জগৎ—এ সবের খবর নাই। (৭০)

মনে করো, দশটা জলপূর্ণ ঘট—তাতে সূর্যের প্রতিবিম্ব।
কটা সূর্য দেখা যাচ্ছে?
দশটা প্রতিবিম্ব-সূর্য।—সত্য-সূর্য তো আছেই।
মনে করো, একটা ঘট ভেঙে দিলে,
এখন কটা সূর্য দেখা যায়?
নয়টা।—সত্য-সূর্য তো আছেই।
আচ্ছা, মোট নয়টা ঘট ভেঙে দেওয়া গেল,
কটা সূর্য দেখা যাবে?
কেবল একটা প্রতিবিম্ব সূর্য।—সত্য-সূর্য তো আছেই।
শেষ ঘট ভাঙলে কি থাকবে?
ঐ সত্য-সূর্য।
না।
কি থাকে তা বলা যায় না মুখে।
যা আছে তাই আছে।
প্রতিবিম্ব না থাকলে সত্য-সূর্য যে আছে—জানবে কি করে? (৫৪৬)

শূন্যে শূন্য মিলাইল

থিয়েটারে অভিনয়।
কথা কইছে লোকে।
এমন সময়ে পর্দা উঠল,
সকলের মন অভিনয়ে,
বাহ্যদৃষ্টি নাই,
এর নাম সমাধি।

আবার পড়ল পর্দা।
মায়া যবনিকা।
মন এখন বহির্মুখ। (৯৬১)

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয়,
গায়ত্রী লয় ওঁকারে।
একবার ওঁ বললে যখন সমাধি—
তখন পাকা। (৭৭৭)

সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কূলকিনারা নাই,
ভক্তি-হিমে স্থানে-স্থানে জল জমাট।
ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত, সাকার।
জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়,
ঈশ্বরে আর হয় না ব্যক্তিবোধ, রূপদর্শন আর নয়।
তিনি কী—কে বলবে ?
যিনি বলবেন নেই তিনিই। (৪৮, ১৭০)

পূর্ণজ্ঞান হলে চুপ হয়ে যায় মানুষ।
যতক্ষণ বিচার শেষ হয়নি ততক্ষণ ফড়্ ফড়্ তর্ক,
শেষ হয়ে গেলে চুপ।
যতক্ষণ পূর্ণ হয়নি কলসী, ততক্ষণ ভক্‌ভক্‌,
পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ নাই,
পুকুরের জল ও কলসীর জল এক। (৪৮, ৪১৭)

বহির্মুখ অবস্থায় স্থূল দেখে।
মন থাকে অন্নময় কোষে।
তারপর সূক্ষ্মশরীর—
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন।
তারপর কারণ-শরীর ;
মন তখন আনন্দময় কোষে।
এইটি অর্ধবাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের।
তারপর মন লীন ; মহাকারণে মনের নাশ।
এইটি চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা।
অন্তর্মুখ অবস্থা কি রকম জানো ?
দয়ানন্দ বলেছিল—
অন্দরে এসো—কপাট বন্ধ ক'রে। (৩৩৬)

সমাধিস্থ হলে থাকে না জ্ঞানবিচার।
যতক্ষণ জীব-জগৎ, আমি-তুমি বোধ,
ততক্ষণ বিচার।

মনুমেণ্টের নীচে আছো যতক্ষণ—
ততক্ষণ দেখছ, গাড়ি ঘোড়া সাহেব মেম।
উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধূ-ধূ।
বাড়ি ঘোড়া গাড়ি মানুষ—
পিঁপড়ের মতো।

কাঠ পোড়াবার সময় পড়্‌পড়্‌ শব্দ, আর আগুনের ঝাঁঝ।
যখন সব শেষ, ছাই পড়ল,
তখন শব্দ নাই।
শান্তি।

ঈশ্বরের নিকট যত এগিয়ে যাবে—তত শান্তি।
গঙ্গার নিকট যত যাবে—তত শীতল।
স্নান করলে—আরও শান্তি। (৬২৪-২৫, ৮০৪)

ঈশ্বরের দিকে যত এগোবে তত কমবে কর্মের আড়ম্বর।
ব্রাহ্মণভোজন, খুব হৈ-চৈ,
পাতায় বসলে অনেক কমল।
তখন কেবল 'লুচি আনো, লুচি আনো।'
লুচি-তরকারি খাওয়া যখন আরম্ভ, বার আনা শব্দ নেই।
যখন এলো দই—তখন সুপ্‌ সুপ্‌,
শব্দ নেই বললেই হয়।
খাবার পর নিদ্রা।
একেবারে চুপ। (৪১, ১৬৩)

যখন সব উপাধি চলে যায়,
বিচার বন্ধ হয়ে যায়—
তখন দর্শন।
মানুষ তখন অবাক, সমাধিস্থ। (৮০৮)

তাঁর দর্শনে মানুষ আনন্দে বিহ্বল
চুপ

সাত দেউড়ির পরে রাজা। রাজদর্শনে গেল এক ব্যক্তি।
প্রথম দেউড়িতে দ্যাখে—
এক ঐশ্বর্যবান পুরুষ, অনেক লোকজন, খুব জাঁকজমক।
লোকটি শুধাল সঙ্গীকে—এই কি রাজা?
সঙ্গী ঈষৎ হেসে বললে—না।
দ্বিতীয় দেউড়িতে আরও ঐশ্বর্য ও ঐশ্বর্যবান পুরুষ।
এই কি রাজা?
না।
সে আরও এগিয়ে যায়, দ্যাখে—বাড়ছে ঐশ্বর্য আর জাঁক।
সাত দেউড়ি পর্যন্ত একই অভিজ্ঞতা।
তারপর যা দেখল—
অবাক।
আর জিজ্ঞাসা নাই।
চুপ। (৮২২, ৮৯৩)

বুদ্ধি যখন লয় হয় বোধস্বরূপে
তখন ব্রহ্মজ্ঞান।
তখন মানুষ—বুদ্ধ। (৯৬১)

বুদ্ধ নাস্তিক?
না, নাস্তিক নয়—মুখে বলতে পারে নাই।
বুদ্ধ কি জানো?
বোধস্বরূপকে চিন্তা করতে-করতে
তাই হয়ে যাওয়া।

যারা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে রয়েছে—
তারা বলছে—সব অস্তি।
আর মায়াবাদীরা বলছে—নাস্তি।
বুদ্ধের অবস্থা এই অস্তি নাস্তির পারে। (৬১৩-১৪)

পাখির বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়—
সে উড়ে উড়ে বেড়ায় আকাশ আশ্রয় ক'রে।
এই দেহ, এই জগৎ, যদি ঠিক-ঠিক মিথ্যা বোধ হয়—
তাহলেই আত্মা সমাধিস্থ। (৫৫২)

আনন্দ ! আনন্দ !

অদ্বৈত জ্ঞানের পর চৈতন্যলাভ।
চৈতন্যলাভের পর আনন্দ।
অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ। (৭৫, ৯৩৪)

মাছগুলো খেলে বেড়াচ্ছে।
দেখলে আনন্দ।
যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে ক্রীড়া করছে—
আত্মারূপ মীন। (২৫৫)

ছেলে কাঁদে কতক্ষণ ? যতক্ষণ-না স্তন পায়।
পেলেই কান্না বন্ধ, কেবল আনন্দ।
আনন্দে মার দুধ খায়।
খেতে-খেতে খেলা করে মাঝে-মাঝে,
আবার হাসে। (২৩৬)

মাটির নীচে আছে কলসীভরা ধন।
সে ধন চাইতে হলে খুঁড়তে হবে মাটি,
মাথার ঘাম পড়বে পায়ে।
অনেকক্ষণ খোঁড়ার পরে যখন কোদাল লাগল কলসীর গায়ে,
শব্দ হল ঠং—তখন আনন্দ।
যত ঠং ঠং শব্দ—তত আনন্দ !
কোদাল ফেলে কলসী বার ক'রে, কলসী দেখে নাচে।
কলসী থেকে মোহর ঢালে, হাতে করে গণে।
দর্শন—স্পর্শন—সম্ভোগ।
আনন্দ ! আনন্দ ! আনন্দ ! (১৯৪, ৩৫৮, ৬৬১)

হৃষীকেশের এক সাধু সকালবেলায় উঠে
গিয়ে দাঁড়ায় ঝরনার কাছে।
সমস্ত দিন ঝরনা দ্যাখে আর বলে ঈশ্বরকে—
'বাঃ বেশ করেছ ! বাঃ বেশ করেছ ! কি আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !'
তার অন্য জপ-তপ নাই।
রাত্রি হলে ফিরে যায় কুটীরে। (৭৭৭)

পুণ্য পুরুষ

লোকশিক্ষক

আচার্য তিন প্রকার!
যিনি ধর্ম-উপদেশ দিয়ে আর খবর লন না শিষ্যদের—
তিনি অধম আচার্য।
যিনি শিষ্যদের বারবার বোঝান, অনুনয় বিনয় করেন,
যাতে উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে—
তিনি মধ্যম আচার্য।
আর, শিষ্যরা যখন শুনছে না কোনোমতে,
তখন তিনি জোর পর্যন্ত করেন—
তিনি উত্তম আচার্য। (১৭৭)

সামান্য আধারে হয় না লোকশিক্ষা।
হাবাতে-কাঠ নিজে ভেসে যায় একরকম,
ডুবে যায় একটা পাখি বসলেও।
নারদাদি বাহাদুরী কাঠ,
নিজে ভেসে যায়,
আবার বয়ে নিয়ে যেতে পারে—
মানুষ, গরু, এমনকি হাতী পর্যন্ত। (৫২)

লোকশিক্ষা দেবে—তার চাপরাশ চাই।
নইলে হাসির কথা হয়ে পড়ে।
কাণা নিয়ে যাচ্ছে কাণাকে—
পথ দেখিয়ে!! (৪১)

শুধু ভিতরে ত্যাগ নয়, বাইরেও চাই ত্যাগ।
তবে লোকশিক্ষা। (৭৬৯)

নিজের বধের জন্য একটি নরুণই যথেষ্ট।

পরকে মারতে হলে চাই ঢাল তরোয়াল।
শাস্ত্রাদি—ঢাল তরোয়াল। (৯২০)

কেউ খেয়ে বসে থাকে গামছা দিয়ে মুখ মুছে,
পাছে অন্য কেউ টের পায়।
কেউ আবার একটা আম পেলে—
কেটে সকলকে দিলে একটু-একটু,
আপনিও খায়।
নারদাদি আচার্য সকলের মঙ্গলের জন্য—
জ্ঞানলাভের পরেও ছিলেন ভক্তি লয়ে। (১৬৮-৬৯)

যদি আদেশ হয়ে থাকে, দোষ নাই লোকশিক্ষায়।
বাগ্‌বাদিনীর কাছ থেকে যদি আসে একটি কিরণ
তাহলে এমন শক্তি যে,
কেঁচো হয়ে যায় বড়-বড় পণ্ডিতগুলো।
প্রদীপ জ্বাললে ঝাঁকে-ঝাঁকে আসে বাদুলে পোকা,
আপনি আসে, ডাকতে হয় না।
চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে—
ওগো, তুমি এসো আমার কাছে ? (১১১)

ওদেশে ধান মাপবার সময়ে
একজন মাপে, আর একজন দেয় রাশ ঠেলে।
তেমনি যে আদেশ পেয়েছে,
সে যখন লোকশিক্ষা দিতে থাকে
তখন মা পিছন থেকে ঠেলে দেন—
জ্ঞানের রাশ।
সে জ্ঞান আর ফুরোয় না। (১১১, ৬৬৫)

ঈশ্বরের কথা বললে বিশ্বাস করে না লোকে।
যদি কোনো মহাপুরুষ বলেন, আমি দেখেছি ঈশ্বরকে,
সাধারণ লোকে লয় না তাঁর কথা।
লোকে মনে করে,
ও যদি দেখেছে ঈশ্বরকে, দেখিয়ে দিক আমাকে।
একদিনে কি শেখা যায় নাড়ি দেখা ?
ঘুরতে হয় অনেকদিন বৈদ্যের সঙ্গে।
তবে বলা যেতে পারে—

কোন্‌টা কফের, কোন্‌টা বায়ুর, কোন্‌টা পিত্তের নাড়ি।
কোন্‌ নম্বরের সুতো তাকি চিনতে পারে যে-সে ?
সুতোর ব্যবসা যারা করে তাদের দোকানে কিছুদিন থাকো,
তবেই বলতে পারবে ঝাঁ ক'রে—
কোন্‌টা চল্লিশ, কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতো। (২৩৯)

গুরু

গুরুর কৃপায় সব গেরো খুলে যায় এক মুহূর্তে।
ভেলকিবাজি দেখেছ ?
বাজিকর অনেক গেরো বাঁধে দড়ির একধারে,
নিজে ধরে অন্য ধার,
নাড়া দেয় দড়িটাকে দু'একবার,
অমনি খুলে যায়।
অন্য লোকে প্রাণপণেও খুলতে পারে না তা। (২৬৩)

বালিতে চিনিতে মিশাল,
চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন।
শাস্ত্রের মর্ম তাই শুনতে হয়—
সাধুমুখে, গুরুমুখে। (৭৬৪)

গুরুমুখে শাস্ত্রের মর্ম শোনার পরে—
গ্রন্থের আর দরকার কি ?
চিঠিতে খবর এসেছে—পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,
আর একখানা রেলপেড়ে কাপড়।
হারিয়ে গেল চিঠিখানি। খোঁজ খোঁজ।
অনেক খোঁজার পরে মিলল।
পড়ে দ্যাখে—
'পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।'
তখন আবার ফেলে দেয় চিঠি।
এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় হলেই হল। (১৫৫-৫৪ ৭৬৪)

গুরু কাঁচা হলে শিষ্যেরও যন্ত্রণা, গুরুরও যন্ত্রণা।
পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে বাহ্যে যাচ্ছিলাম ঝাউতলায়।
শুনতে পেলুম, খুব ডাকছে কোলাব্যাঙ।

বোধ হল সাপে ধরেছে।
অনেকক্ষণ পরে ফিরে আসছি—তখনও দেখি, ডাকছে সমানে।
উঁকি মেরে দেখি, ঢোঁড়ায় ধরেছে ব্যাঙটাকে।
ছাড়তেও পারছে না, গিলতেও না।
তখন ভাবলাম, হায়. ওকে যদি ধরত জাতসাপে—
তিন ডাকের পর চুপ।
ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা,
তাই সাপেরও যন্ত্রণা, ব্যাঙেরও যন্ত্রণা। (৬০, ৫০)

নিত্যসিদ্ধ

নিত্যসিদ্ধ।
জন্মে-জন্মে তাদের জ্ঞানচৈতন্য।
যেন ফোয়ারা—বুজে আছে।
মিস্ত্রি এটা-ওটা খুলতে-খুলতে ফোয়ারা দিলে খুলে,
অমনি ফরফর ক'রে জল।
নিত্যসিদ্ধের প্রথম অনুরাগ দেখে লোকে অবাক!
কোথায় ছিল এত ভক্তি—বৈরাগ্য—প্রেম! (২৩৪)

ওরা অরণি কাঠ, একটু ঘষলেই আগুন।
না ঘষলেও হয়।
ওরা একটু সাধন করলেই ভগবান লাভ করে,
না করলেও পায়।
লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল পরে ফুল। (৪৭৬)

নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক।
সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়।
ওরা কখনো আসক্ত হয় না সংসারে।
যেমন প্রহ্লাদ।
ওরা পাতালফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।
নিত্যসিদ্ধ হল মৌমাছি,
মধুপান করে কেবল ফুলে ফুলে।
সাধারণ লোক মাছির মতো।
মাছি ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, বিষ্ঠাতেও।
সাধারণ মানুষ সাধন করে, ঈশ্বরে ভক্তি হয়, আবার আসক্ত সংসারেও।

নিত্যসিদ্ধের কেবল হরিরসপান, যায় না বিষয়কথার দিকে,
ঈশ্বরে তার আত্মীয়ের ভালবাসা,
বিধিনিয়ম নেই। (৬৮)

চাতক চায় শুধু ফটিক জল।
গঙ্গা-যমুনা, সাত সমুদ্র, জলে পূর্ণ,
পিপাসায় প্রাণ যায়,
চাতক শুধু উঁচু হয়ে জল চাইছে আকাশের,
পৃথিবীর জল খাবে না। (৪৮৪, ৭৩৭)

নিত্যসিদ্ধ মনে করলে থাকতে পারে সংসারেও।
দুই তলোয়ার নিয়ে খেলতে পারে কেউ-কেউ।
সে এমন খেলোয়াড় যে, ঢিল পড়লে—
ঠিকরে যায় তলোয়ারে লেগে। (৩৬৮)

বেদে আছে হোমাপাখির কথা।
সে পাখি থাকে আকাশে, ডিম পাড়ে আকাশেই।
ডিম পড়তে থাকে।
এত উঁচুতে থাকে পাখি—
পড়তে-পড়তে ডিম যায় ফুটে, বেরিয়ে পড়ে ছানা।
ছানাটি পড়তে থাকে।
তখনো এত উঁচুতে যে, পড়তে-পড়তে—
ছানার পাখা বেরোয়, চোখ ফোটে।
যখন সে মাটির কাছাকাছি, তখন হয়েছে চৈতন্য,
দ্যাখে, মাটিতে পড়লেই মৃত্যু,
অমনি উপর দিকে চোঁ-চোঁ দৌড়—
মার দিকে।
তার এক লক্ষ্য—মার কাছে যাওয়া। (২২৪, ৩১৫)

জনকাদি কাজ করতেন ঈশ্বরকে মাথায় রেখে,
নৃত্যকী যেমন মাথায় বাসন নিয়ে নাচে।
পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই?
মাথায় জলের ঘড়া,
যাচ্ছে হাসতে-হাসতে, কথা কইতে-কইতে। (৮৬৮)

ঈশ্বরের মনুষ্যলীলা কেন জানো ?
এর ভিতর শুনতে পাওয়া যায় তাঁর কথা,
এর ভিতর তাঁর বিলাস। (৫৫৩)

নরলীলায় অবতার।
ছাতের জল পড়ছে নল দিয়ে হুড় হুড় ক'রে।
সচ্চিদানন্দেরই শক্তি—
আসছে একটি প্রণালীর মধ্য দিয়ে। (৬৫৬)

তিনি আসেন অবতার হয়ে।
উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না এসব,
অনুভব হওয়া চাই।
উপমায় কিছুটা আভাস মাত্র।
গরুর শিংটা ছুঁলে ছোঁয়া হল গরুকেই,
পা বা লেজ ছুঁলেও তাই।
কিন্তু গরুর সার পদার্থ দুধ, সেই দুধ আসে বাঁট দিয়ে।
অবতার গাভীর বাঁট। (১৫২, ৯১০)

তাঁর অবতারকে দেখা হলে দেখা হল তাঁকেই।
গঙ্গাজল স্পর্শের জন্য ছুঁতে হয় না সব গঙ্গা,
এক জায়গায় ছুঁলেই হল।
সাগরের কাছে গিয়ে একটু জল স্পর্শ করো,
তাতে সাগর স্পর্শই হল।
অগ্নিতত্ত্ব সব জায়গায় আছে—
তবে কাঠে বেশি (১৫৩)

মানুষের ভিতর তিনি বেশি প্রকাশ।
মাঠে আলের ভিতর ছোট-ছোট গর্ত, তাদের বলে ঘুটী।
ঘুটীর ভিতর জমে থাকে—কাঁকড়া, মাছ।
মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে হয় ঘুটীর ভিতর।
ঈশ্বরকে খুঁজতে হয় অবতারের ভিতর।
চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতর প্রকাশ হন—
জগৎমাতা। (৯৭৩)

অবতারকে চিনতে পারে না সকলে।
দেহধারণ করলে রোগ শোক ক্ষুধা তৃষ্ণা—
সকলই থাকে।
মনে হয়, আমাদেরই মতো।
রাম কেঁদেছিলেন সীতার শোকে। (১৪৪)

তিনি যখন অবতীর্ণ হন তখন ধ্যানের খুব সুবিধা।
দেহটি আবরণ,
যেন লণ্ঠনের ভিতর জ্বলছে আলো,
কিংবা সার্সির ভিতর দিয়ে দেখছি—
বহুমূল্য জিনিস। (১৪৬)

কখনো-কখনো সূর্য অস্ত না যেতে
আকাশে চন্দ্রোদয়।
অবতারাদিতে একাধারে—
ভক্তি-চন্দ্র, জ্ঞান-সূর্য। (১৪০)

রামচন্দ্র সভাতে এলেন, যেন উদয় হল শত সূর্য।
সভাসদবা পুড়ে গেল না, কারণ সে নয় জড়-জ্যোতি,
তাতে প্রস্ফুটিত হল হৃৎপদ্ম সকলের—
যেমন সূর্য উঠলে প্রস্ফুটিত হয় পদ্ম। (২১৯)

সংসারী জীবের জ্ঞান—প্রদীপের আলো।
তাতে দেখা যায় শুধু ঘরের ভিতরটি।
ভক্তের জ্ঞান—চাঁদের আলো।
দেখা যায় ভিতর বাহির।
কিন্তু দেখা যায় না ছোট জিনিস, কি দূরের জিনিস।
অবতারাদির জ্ঞান—সূর্যের আলো।
ভিতর-বার, ছোট-বড়—তাঁরা দেখতে পান সকলই। (৭১৮)

চৈতন্যদেবের জ্ঞান—সৌরজ্ঞান।
তাঁতে আবার ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। (৪৭৮)

ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে।
অবতারাদি ঈশ্বরকোটি।

রাজার ছেলে আপন বাড়িতে সাত তলাতে
করতে পারে যাওয়া-আসা। (৩১৪-১৫)

চৈতন্য—কিনা অখণ্ড চৈতন্য।
গৌরাঙ্গ এই অখণ্ড চৈতন্যের—
একটি স্ফুট। (২৯৫)

রাম ও কৃষ্ণ—
চিদানন্দ-সাগরের দুটি ঢেউ। (৭৫)

মহাকাশ চিদাকাশ থেকে উঠছে—
এক একটি রূপ।
অবতারও একটি রূপ।
অবতারলীলা—আদ্যাশক্তিরই লীলা। (৬২৭)

সকলই তোমার পথ

গাছের উপর বহুরূপী।
একজন দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখলে—কালো,
তৃতীয় ব্যক্তি—হলদে।
নানা লোক দেখলে নানা রঙ।
পরস্পরকে বলছে তারা—
না, জানোয়ারটি সবুজ। না, জানোয়ারটি লাল,
না না, জানোয়ারটি হলদে।
ঝগড়া করছে তারা।
গাছতলায় বসে ছিল একটি লোক,
কাছে যেতে সে বললে,
আমি রাতদিন থাকি এই গাছতলায়,
আমি জানি, এটি বহুরূপী, ক্ষণে-ক্ষণে রঙ বদলায়।
আবার কখনো থাকে না কোনো রঙ। (৪৯, ১৭০, ৩১০-১১, ৯৩১)

একজনের ছিল একটি গামলা, লোক আসত কাপড় ছোপাতে!
গামলায় গোলা আছে রঙ।
যার যে রঙ দরকার—
গামলাতে কাপড় ডোবালেই হয়ে যেত সেই রঙ।
তা দেখে অবাক হয়ে রঙওয়ালাকে, বলছে একজন—
তুমি যে-রঙে রঙেছ ভাই
সেই রঙটি দাও আমায়। (১৬৯-৭০, ১৯০, ৯৩০)

বস্তু এক, নাম আলাদা।
সকলে চায় একই জিনিস।
তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।
একটা পুকুরে অনেকগুলি ঘাট।
হিন্দুরা কলসী ক'রে জল নেয় এক ঘাট থেকে,
বলে—জল।

মুসলমানেরা চামড়ার ডোলে জল নেয় অন্য ঘাট থেকে,
বলে—পানি।
খ্রীস্টানেরা নেয় আর এক ঘাট থেকে গেলাসে ক'রে,
বলে—ওয়াটার।
কেউ যদি বলে, জিনিসটা জল নয়, পানি,
কিংবা বলে, পানি নয়, ওয়াটার,
কিংবা বলে, ওয়াটার নয়, জল,
তাহলে হয়ে পড়ে হাসির কথা।
এই ভাবেই ধর্ম নিয়ে দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া,
লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি। (২৯৩)

কেউ কেউ ঝগড়া ক'রে বলে—
আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা—
এসব মতুয়ার বুদ্ধি।
তিনি কত কি, তা বলা যায় না।
কতকগুলো কানা এসে পড়েছিল একটা হাতীর কাছে।
কেউ একজন তাদের বলে দিলে, জানোয়ারটির নাম হাতী।
তারপর জিজ্ঞাসা করলে, হাতীটা কি রকম ?
কানারা হাতীর গা স্পর্শ করতে লাগল।
একজন বললে, হাতী থামের মতো।
সে ছুঁয়েছিল পা।
একজন বললে, হাতী কুলোর মতো।
সে দিয়েছিল কাণে হাত।
তেমনি যারা হাত দিয়েছিল শুঁড়ে কি পেটে—
তারা বলতে লাগল নিজের মতো ক'রে। (২২২)

যদি কেউ বলে—ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার,
আমি বলি, থাকলই বা।
ভুল আছে সকল ধর্মেই।
ব্যাকুলতা থাকলেই হল, তাঁতে ভালোবাসার টান। (৮৭৫)

মা, সবাই বলছে—
ঠিক চলছে আমার ঘড়ি।
হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী—
সবাই বলে, আমার ধর্ম ঠিক।
কিন্তু মা, কারো ঘড়িই তো ঠিক চলছে না !

কে তোমাকে ঠিক বুঝতে পারবে ?
তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে —
সব পথ দিয়েই পৌঁছান যায় তোমার কাছে। (৮৬৪-৬৫)

আমি বলি, তাঁকে ডাকছে সকলেই,
দ্বেষাদ্বেষীর দরকার কি !
কেউ বলছে সাকার, কেউ নিরাকার।
যার যা বিশ্বাস, সে চিন্তা করুক তাই।
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানা ধর্ম করেছেন ঈশ্বর।
সব মতই পথ—
মত কিছু ঈশ্বর নন।

দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ করবে,
নিরাকারবাদীও।
মিছরির রুটি সিধে ক'রে খাও, বা আড় ক'রে,
মিষ্টি লাগবে। (১১৯)

তোমরা সাকার মানো না, তা বেশ।
তোমরা নেবে সাকারবাদীর টানটুকু,
যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান,
যেমন ভক্তের মা-মা ডাক।
ভাবটি নেবে।
মূর্তি নাই-বা মানলে। (৮৯১)

যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক।
অনেকেই একঘেয়ে।
আমি কিন্তু দেখি, সব এক।
শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তী —সবই একেকে লয়ে। (৭০৫)

জ্ঞানীরা যাঁকে বলেন ব্রহ্ম,
যোগীরা তাঁকেই বলেন আত্মা,
ভক্তেরা বলেন ভগবান।
একই ব্রাহ্মণ—
যখন পূজা করেন তখন পূজারী,
যখন রাঁধেন তখন রাঁধুনি। (৩৩)

সাকার, নিরাকার।
রোশনচৌকিওলার একজন শুধু পোঁ ধরে,
অথচ তার বাঁশির সাত ফোকর।
আর একজন—তারও সাত ফোকর—
সে বাজায় নানা রাগরাগিণী। (৮৬৯)

যিনি সাকার তিনিই নিরাকার।
যেমন মহাসমুদ্র—অনন্ত জলরাশি—কূলকিনারা নাই।
জলের কোনো স্থান জমাট বেঁধে বরফ।
ভক্তিহিমে জমাট বেঁধে সাকার রূপদর্শন।
আবার যেই সূর্য উঠল, গলে গেল বরফ—
যে জল সেই জল।
জ্ঞানসূর্য ওঠায় বরফ গলে সব নিরাকার। (৪৫৯)

বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে যেমন
মনে পড়ে বাপকে,
প্রতিমায় পূজা করতে-করতে তেমনি
উদ্দীপন হয় সত্যের। (৬২৭)

দোষ কি প্রতিমা পূজায় ?
বেদান্ত বলে, যেখানে অস্তি ভাতি আর প্রিয়,
সেইখানে তাঁর প্রকাশ।
ছোট মেয়েরা পুতুলখেলা করে কতদিন ?
যতদিন না স্বামী-সহবাস।
বিয়ে হলে পুতুলগুলো তুলে ফেলে পেটরায়।
ঈশ্বরলাভ হলে প্রতিমাপূজার কি দরকার ? (২৮০)

অনন্তব্রত করে।
কিন্তু পূজা করে—বিষ্ণুরই।
তাঁরই মধ্যে অনন্তরূপ। (৬৩০)

ঈশ্বরীয় রূপে অবিশ্বাস করো না।
বিশ্বাস করো—রূপ আছে।
তারপর যে-রূপটি ভালোবাসো
ধ্যান করো সেই রূপের। (৭৫)

মাটি কেন গো–!
চিন্ময়ী প্রতিমা। .(১৭)

আমি বলি—
জড় আবার কি? সবই চৈতন্য। (৫৫৫)

যত এগোবে—তত কমবে ভগবানের উপাধি।
ভক্ত প্রথমে দেখলে—দশভুজা।
আরও এগিয়ে দেখে—ষড়্‌ভুজা।
আরও এগিয়ে—দ্বিভুজ গোপাল।
আরও এগিয়ে গেল—
এখন জ্যোতিদর্শন—কোনো উপাধি নাই। (৫৮৬)

সংসার বৃত্ত

বদ্ধজীব

বদ্ধজীব জালে বদ্ধ—সে জ্ঞান নেই তার।
হরিকথা সম্মুখে হলেও চলে যায়,
বলে, মরবার সময়ে হরিনাম, এখন কেন ?
ঈশ্বরচিন্তা করে না।
মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ ক'রে ধন উপায়।
যারা ঈশ্বরচিন্তা করে, ধ্যান করে,
তাদের উড়িয়ে দেয় পাগল বলে।
অবসর হল তো গপ্প করে আবোল-তাবোল,
নয় মিছে কাজ।
বলে, বসে থাকতে পারি না চুপ ক'রে—
তাই বেড়া বাঁধছি।
হয়তো সময় কাটেনা দেখে তাস খেলে।
কত শোক তাপ পায়,
তবু কিছুদিনের মধ্যে যেমন তেমনি।
স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে।
ছেলে মরে গেল, শোকে কাতর, তবু বছর বছর ছেলে।
বলে, কি করব, অদৃষ্টে ছিল।
যে-মা ছেলের শোকে অধীর,
সে আবার চুল বাঁধল, গয়না পরল।
মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত—তবু মেয়ে হচ্ছে বছর-বছর।
মোকর্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত—আবার মোকর্দমা।
তীর্থ করতে গিয়ে অবসর পায় না ঈশ্বরচিন্তার,
পরিবারদের পুঁটুলি বইতে প্রাণ যায়।
মন্দিরে গিয়ে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়াতে ব্যস্ত,
ঠাকুরদর্শন হয় না।
যখন মরে—তখন পরিবার ও ছেলেদের কথা ভেবে কাঁদে,
হায়, আমি মলে কী হবে এদের !
এমনি মায়া যে, মৃত্যুকালে বলে—
প্রদীপে সলতে অত বেশী জ্বলছে কেন ?
ওতে বেশি তেল পুড়বে, কমিয়ে দাও।
উট কাঁটাগাছ বড় ভালবাসে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে দরদর,
তবু খাবে, ছাড়বে না।

বুঝেছে, সংসারে সার নেই,
আমড়াতে কেবল আঁটি আর চামড়া,
তবু পারে না ছাড়তে।
সংসার থেকে সরিয়ে ভালো জায়গায় রাখলে—
হেঁদিয়ে মরবে।
বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ, ঐতেই হৃষ্টপুষ্ট।
সে পোকাকে হাঁড়িতে রাখো—
বাঁচবে না। (২৪, ৫৬-৫৭, ১২৬)

যাদের ঈশ্বরে ভক্তি নেই তাদের বলি—
তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বসো।
অথবা বলি, বেশ বিল্ডিং, যাও দেখো গে।
ভক্তদের সঙ্গে হয়ত হাবাতে লোক এসেছে,
ভারী বিষয়বুদ্ধি, ঈশ্বরীয় কথায় মন নেই,
ভক্তরা আমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা বলছে দেখে
ছটফট করে, কাণে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে,
কখন যাবে ? কখন যাবে ?
ভক্তরা হয়ত বলল, দাঁড়াও হে, যাব আর একটু পরে।
তাতে তারা বিরক্ত—
'তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।' (৪৫-৪৬)

বাসনার ভৃত্য

অত পাশ-করা, ইংরাজি-পড়া সব পণ্ডিত,
মনিবের চাকরি নিয়ে বুটজুতোর গোঁজা খায় দুবেলা।
কারণ—কামিনী।
বিয়ে ক'রে নদের হাট বসিয়ে, আর হাটতোলার জো নাই।
তাই এত অপমান—দাসত্বের যন্ত্রণা। (৫৯)

ছেলের কথায় সংসারীর লাল পড়ে।
কেউ যদি ছেলের সুখ্যাত করল তো অমনি বলবে—
ওরে, তোর খুড়োর জন্য পা ধোবার জল আন্। (৪৮৭)

এক ডেপুটি, আটশো টাকা মাইনে,
কেশব সেনের বাড়িতে গিয়েছিল নববৃন্দাবন নাটক দেখতে।

আমি যেখানে বসেছি সেখানে এল।
রাখাল একটু বাইরে গেছল, ছেলেটিকে বসাল সেই জায়গায়।
আমি বললুম, এখানে হবে না।
যতক্ষণ নাটক হল, তার কেবল ছেলের সঙ্গে কথা।
শালা, একবারও কি থিয়েটার দেখলে ?
শুনেছি, মাগের দাস,
ওঠ্ বললে ওঠে, বোস্ বললে বসে।
আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই ! (৫২৮)

সবাই নিজের পরিবারকে সুখ্যাত করে,
তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক।
যাকেই জিজ্ঞাসা করি সেই বলে—
আজ্ঞা হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভালো।
একজনের স্ত্রীও কি মন্দ নয় ? (৬১৬, ১০৫)

তা, স্ত্রীর উপর ভালবাসা হবে না ?
জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া।
মনে হয়, পৃথিবীতে অমন আপনার লোক হবে না—
জীবনে মরণে—ইহকালে পরকালে। (৯৫২)

আবার স্ত্রী নিয়ে কী না দুঃখভোগ ! দুরবস্থা !
কুড়ি টাকা মাইনে, তিনটে ছেলে,
ভালো ক'রে খাওয়াবার পয়সা নেই,
জল পড়ছে বাড়ির ছাত দিয়ে,
ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারছে না,
পৈতে দিতে পারে না,
এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে। (৯৫২)

স্বামী স্ত্রীর যদি মিল না হয় বড় যন্ত্রণা।
স্ত্রী হয়ত রাতদিন বলে—বাবা এখানে কেন বিয়ে দিলে,
না পেলুম খেতে, না পারলুম বাছাদের খাওয়াতে।
না পেলুম পরতে, না পারলুম বাছাদের পরাতে !
পেলুম না একখানা গয়না। কি সুখে রেখেছ আমায় ?
চোখ বুজে কেবল ঈশ্বর ! ঈশ্বর !
ওসব পাগলামি ছাড়ো ! (৯০)

কামিনী কাঞ্চন নিয়ে যারা থাকে—
তারা থাকে নেশায়, কিন্তু বুঝতে পারে না।
দাবাবোড়ে খেলোয়াড় অনেক সময়ে জানে না—
কী ঠিক চাল ?
বাহির থেকে যারা দ্যাখে—তারা বুঝতে পারে অনেকটা। (৬৯৬)

বিষয়বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না।
দুধ রাখা যায় নূতন হাঁড়িতে,
দই-পাতা হাঁড়িতে রাখলে দুধ নষ্ট।
রসুনের বাটি হাজার ধোও—
গন্ধ যাবে না। (৯৮২)

যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা,
সেই ঘরেই বিকারের রোগী।
রোগ সারবে কেমন ক'রে ?
আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে।

পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক—আচার তেঁতুল,
আর বিষয়তৃষ্ণা—জালার জল।
সে তৃষ্ণার শেষ নেই।
বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব।

সংসার বড় কঠিন।
এদিকে যাবি—কোঁস্তা ফেলে মারব।
ওদিকে যাবি—ঝাঁটা ফেলে মারব। (৩৯, ২৫৬)

পুরুষগুলো বুঝতে পারে না কত নেমে গেছে।
গাড়ি করে যখন কেল্লায় পৌঁছলাম,
বোধ হয়েছিল যেন এসেছি সাধারণ রাস্তা দিয়ে।
রাস্তা কিন্তু কলমবাড়া।
যাকে ভূতে পায়—
সে জানতে পারে না তাকে ভূতে পেয়েছে।
সে ভাবে—বেশ আছি। (২৫৭, ৬৯৫)

কত লোক এলো গেলো, কত জন্ম, কত দেহত্যাগ,
সংসার এই আছে, এই নাই।

যাদের এত 'আমার আমার' করছ—
চোখ বুজলেই নাই।
তবু নাতির জন্য কাশী যাওয়া হল না—
'আহা আমার হারুর কি হবে ?' (৮৯)

অর্থ ও অনর্থের জাল

অর্থেই অনর্থ।
ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ আছে, কিন্তু হিস্যে নিয়ে গোল।
গা চাটাচাটি করে কুকুরেরা, পরস্পর বেশ ভাব,
কিন্তু গৃহস্থ যদি ফেলে দেয় দুটি ভাত—
অমনি কামড়া-কামড়ি। (৯৫৮)

অর্থ যার দাস—সে-ই মানুষ।
অর্থের ব্যবহার যারা জানে না--
মানুষ হয়েও তারা মানুষ নয়।
আকৃতি মানুষের, ব্যবহার পশুর। (১৩২)

বৃথা জমাবার চেষ্টা।
অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈরী করে,
আর একজন এসে নিয়ে যায় ভেঙে। (৮৩৯)

খোসামুদের কথায় ভুলো না।
বিষয়ী দেখলেই খোসামুদে জোটে।
মরা গরু পেলেই—
এসে জোটে যত শকুনি। (৩৪৭)

সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস—
মাগের দাস,
মনিবের দাস,
টাকার দাস। (৩৪৭)

সংসারে শুধু কামের ভয় ?
তা নয়।
ক্রোধও আছে।

কামনার পথে কাঁটা পড়লেই—
ক্রোধ। (২৫৭)

উপাধির ব্যাধি

উপাধির কিছু হল তো জীবের স্বভাব গেল বদলে।
পরনে যেমনি উঠল কালাপেড়ে ধুতি,
অমনি মুখে নিধুব টপ্পা, সেই সঙ্গে তাসখেলা,
বেড়াতে যাবার সময়ে স্টিক্।
ডিগ্‌ডিগে বোগা লোক, যদি পরেছে বুটজুতো,
তখনি মুখে শিস্, লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়িতে ওঠা,
সাহেবদেব মতো।
যদি পেযেছে কলম হাতে,
অমনি কাগজ টেনে নিযে ফ্যাঁস্-ফ্যাস টান।
যদি টাকা হয়েছে কারো,
সে অন্যবকম হয়ে গেল, আগের মানুষ নেই।
এক ব্রাহ্মণ এখানে যাতায়াত করত, খুব বিনযী।
কিছুদিন পরে কোন্নগরে গেছি, সঙ্গে হৃদে,
নৌকা থেকে নামছি, দেখি গঙ্গার ধারে ব্রাহ্মণ বসে।
হাওয়া খাচ্ছিল।
আমাদের দেখে বলছে, কি ঠাকুর, বলি আছো কেমন?
কথার স্বর শুনে হৃদেকে বললুম—
ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এমন কথা।
একটা ব্যাঙ একটা টাকা পেয়েছিল,
গর্তে রেখেছিল সেটিকে,
এক হাতি গর্ত গেল ডিঙিয়ে,
ব্যাঙ বেরিয়ে এসে লাথি দেখাতে লাগল হাতিকে,
বলতে লাগল মহা রাগে—
কি, তোর এত বড় সাহস, আমাকে ডিঙিয়ে যায়?
ব্যাঙটার একটা টাকা ছিল। (৬১)

একটু-আধটু বই পড়েছে অমনি অহঙ্কার।
অমুক বাবুর সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছিল—
সে বললে, আমি ওসব জানি।
আমি বললুম—

যে দিল্লী গিয়েছিল সে কি জাঁক ক'রে বেড়ায়—
আমি দিল্লী গেছি ?
বাবু কি বলে, আমি বাবু ? (২০০)

একটু গীতা, একটু ভাগবত, একটু বেদান্ত পড়ে
লোকে মনে করে, আমি বুঝে ফেলেছি সবই।
চিনির পাহাড়ে গিছল পিঁপড়ে—
এক দানা চিনি খেয়েই হেউ ঢেউ,
আর এক দানা মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাসায়,
যাবার সময়ে ভাবছে—
এবার এসে নিয়ে যাব সমস্ত পাহাড়টা। (৩৩৩)

যারা শুধু পণ্ডিত তাদের কথা গোলমেলে।
সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল—
ঈশ্বর নীরস,
তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস করো তাঁকে।
বেদে যাঁকে বলেছে রসস্বরূপ,
তাঁকে কিনা বলে নীরস !!
একজন বলেছিল—আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া।
একথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদপেই নাই,
কেননা গোয়ালে থাকে না ঘোড়া।
যে ব্যক্তি জানে না, ঈশ্বর কী—
সেই বলে ঐসব গোলমেলে কথা। (৮৭, ১০২-০৩)

শুধু পড়াশোনাতে কিছু হয় না।
বাজনার বোল
লোকে বেশ মুখস্থ বলে,
হাতে আনা বড় শক্ত। (৩০০)

শুধু পাণ্ডিত্যে কী হবে ?
অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, জানা থাকতে পারে পণ্ডিতের,
কিন্তু সংসারে আসক্তি থাকলে ধারণা হয় না শাস্ত্রের।
মিছে পড়া।
পাঁজিতে লিখেছে, বিশ-আড়া জল,
পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না।
পণ্ডিত কথা কয় লম্বা-লম্বা,

নজর কিন্তু দেহসুখ আর টাকায়।
শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে—নজর ভাগাড়ে।
কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার। (৪৫৭, ১৫৬০)

যারা সংসারকে সার করেছে
তাদের কথা নিয়ে কি হবে? (৫৯৪)

একজন এসে বললে, ও-পাড়ায় দেখে এলুম—
অমুকের বাড়ি পড়ে গেছে হুড়মুড় ক'রে।
যাকে বললে সে লোক ইংরাজি লেখাপড়া জানে।
সে বললে, দাঁড়াও, একবার দেখি খবরের কাগজে কি লিখেছে?
কাগজ পড়ে দ্যাখে, বাড়ি ভাঙার কথা কিছুই নাই।
তখন বললে, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না।
কই, বাড়ি ভাঙার কথা তো কাগজে নাই?
ওসব মিছে কথা। (১৭৬)

পদ্মলোচন বর্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত,
ভারী জ্ঞানী, কিন্তু অভিমান ছিল না।
বিচার হচ্ছিল এক সভায়—শিব বড় না ব্রহ্মা বড়?
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা শেষে জিজ্ঞাসা করলে পদ্মলোচনকে।
পদ্মলোচন বললে—
আমার চোদ্দপুরুষ শিবও দেখেনি, ব্রহ্মাও দেখেনি,
আমারও তাঁদের সঙ্গে আলাপ নেই,
আমি কি ক'রে বলব? (৭০, ৮৯৫)

প্রয়োজনীয় সতর্কতা

এই কয়েকটি থেকে সাবধান—
প্রথম—বড় মানুষ।
বড় মানুষের টাকা আছে, লোকজন অনেক,
মনে করলে অনিষ্ট করতে পারে,
তাদের কাছে কথা কইতে হয় সাবধানে।
তারপর—কুকুর।
কুকুর তেড়ে আসে, ঘেউঘেউ করে,
তখন দাঁড়িয়ে মুখে আওয়াজ ক'রে ঠাণ্ডা করতে হয়।

তারপর—ষাঁড়।
গুঁতুতে এলে তাকেও ঠাণ্ডা করতে হয় মুখে আওয়াজ ক'রে।
তারপর—মাতাল।
যদি রাগিয়ে দাও তাহলে বলবে—
তোর চোদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন।
তাকে বলতে হয়—কি খুড়ো, কেমন আছো ?
তাহলে খুশি হবে,
তোমার কাছে বসে তামাক খাবে। (৩১১-১২)

সাবধান থাকবে এদের থেকে—
প্রথম, মুখ-হলসা—
হল্-হল্ ক'রে কথা কয়।
তারপর, ভেতর-বুঁদে—
মনে ডুবুরি নামালেও তল পাবে না।
তারপর, কান্-তুলসে—
কানে তুলসী, ভক্তি জানাবার জন্য।
তারপর, দীঘল-ঘোমটা নারী—
লম্বা ঘোমটা, লোকে ভাবে, ভারী সতী, তা কিন্তু নয়।
আর পানাপুকুরের জল—
নাইলেই সান্নিপাতিক। (১৫৩)

সংসারের রূপ ও রঙ্গ

গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে। যত রাজ্যের কথা।
বিধবা পিসি বলছে—
'আমি না হলে দুর্গাপূজা হয়না—শ্রীটি গড়া পর্যন্ত।
বাড়িতে বিয়ে-থা হলে সব করতে হবে আমায়—
ফুলশয্যের যোগাড়, এমন কি খয়েরের বাগানটিও।'

ছাতের উপর ঠাকুরঘর—নারায়ণপূজার আয়োজন।
পূজার নৈবেদ্য, চন্দনঘষা চলছে,
কিন্তু ঈশ্বরের কথা একটিও নাই।
'আজ বাজারে কিছু ভালো পাওয়া গেল না।'
'কাল, অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল।'
'ও-ছেলেটি আমার খুড়তুতো ভাই।'

'হাঁরে তোব সে কর্মটি আছে ?'
'আর আমি কেমন আছি !—আমার হরি নাই !'—
এইসব কথা—ঠাকুরঘরে। (৪৫৩)

স্বার্থপর লোকের কথা তো জানো !
এখানে মোত্ বললে মুতবে না—
পাছে তোমাব উপকার হয়।
এক পয়সাব সন্দেশ আনতে দিলে—
এনে দেবে চুষে-চুষে। (৫২)

যাত্রা হচ্ছিল এক জায়গায়।
একজনেব ভারী শোনার ইচ্ছা।
উঁকি মেবে দেখলে, আসরে প্যালা পড়ছে।
দেখেই আস্তে-আস্তে পালিয়ে গেল।
অন্য এক জাযগাতেও যাত্রা।
সেখানে সন্ধান ক'বে জানলে, কেউ প্যালা দেবে না।
ভাবী ভিড়।
কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে সে আসরের সামনে হাজির,
ভালো ক'রে বসল,
তারপর শুনতে লাগল গোঁপে চাড়া দিয়ে। (৫২৮)

একটা মাতাল দুর্গাপ্রতিমা দেখছিল।
প্রতিমার সাজ দেখছে আব বলছে—
যতই সাজোগোজো মা,
তিনদিন পরে তোমায়—
টেনে ফেলে দেবে গঙ্গায। (১২৫)

ঢঙ ক'রে শোক কবে অনেকেই।
কাঁদতে হবে জেনে আগে খোলে নৎ, গয়না,
চাবি দিয়ে বেখে দেয় বাক্সে,
তারপর আছড়ে পড়ে, কাঁদে—
'ওগো দিদি গো, আমার কি হল গো !' (৫৪০)

একজনার বাড়ি দুর্গোৎসব হত।
উদয়াস্ত পাঁটাবলি।
কয়েক বৎসর পরে বলির ধূমধাম নাই।

একজন জিজ্ঞাসা করলে কর্তাকে—
মশাই, আজকাল বাড়িতে বলির ধূমধাম নেই কেন ?
কর্তা বললেন—
আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গেছে !

ঝাঁট দিচ্ছে একজন।
কোনো লোক এসে বললে—
ওগো, অমুক নেই, মারা গেছে।
সে ঝাঁট দিতে-দিতেই বলতে লাগল—
'আহা, তাই তো গো, লোকটি মারা গেল, বেশ ছিল।'
আর যদি তার আপনার লোক হয়,
তাহলে ঝাঁটা পড়ে যায় হাত থেকে—
'অ্যাঁ—আ' বলে বসে পড়ে। (২৫৯)

বিকার বৈকি।
দ্যাখো না, সংসারীরা কোঁদল করে।
কি লয়ে কোঁদল করে তার ঠিক নেই।
কোঁদল কেমন ?
তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি।
চেঁচামেচি, গালাগালি। (২৬২)

বিকার থাকলে কত কি বলে—
'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো,
এক জালা জল খাবো রে !'
বৈদ্য বলে—'খাবি ? আচ্ছা খাবি।'
এই বলে তামাক খায়। (৫৭১)

বৈদ্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম, অধম।
যে-বৈদ্য এসে, নাড়ি টিপে, 'ঔষধ খাও হে' বলে চলে যায়—
সে অধম বৈদ্য।
যে-বৈদ্য ঔষধ খেতে রোগীকে বোঝায় অনেক ক'রে—
'ওহে, ঔষধ না খেলে কেমন ক'রে ভালো হবে,
লক্ষীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি—খাও !'—
সে মধ্যম বৈদ্য।
আর যে বৈদ্য, রোগী কোনোমতে খেল না দেখে,
বুকে হাঁট দিয়ে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। (৪৭

যার যা ভাব তাই নিয়ে থাকে।
বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে—রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম।
ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন মূর্তি।
প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড়।
যারা বৈষ্ণব তারা বেশি দাঁড়িয়ে রাধাকৃষ্ণের কাছে,
যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে,
রামভক্তরা সীতারামের কাছে।

বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে—এমন মূর্তিও করে।
যাদের কোনো ঠাকুরে মন নেই তারা সেখানে দ্যাখে হাঁ ক'রে.
চীৎকাব ক'রে বন্ধুদের ডাকে—
আবে ওসব কি দেখছিস্ এদিকে আয়, এদিকে আয়। (৭৬০)

তোতাপুরী দৃষ্টান্ত দিয়ে বলত—
মতের বিবাদের জন্য সাধুসেবা হল না।
এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল, অনেক সাধুসম্প্রদায় এসেছে,
সবাই বলে, আমাদের সেবা আগে, তারপরে অন্য সম্প্রদায়ের।
মীমাংসা হল না কিছুতে।
শেষে সকলে চলে গেল, আর খাওয়ানো হল বেশ্যাদের। (৯৪১)

পণ্ডিত হেসে উদ্ভট শ্লোক ব্যাখ্যা করছেন—
দর্শনাদি শাস্ত্রের চেয়ে কাব্য মনোহর।
কাব্যপাঠ হলে শুষ্ক বোধ হয় বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল।
কাব্য অপেক্ষা গীত মনোহর। সঙ্গীতে গলে যায় পাষাণ-হৃদয়।
গীতের এত আকর্ষণ, তবু—
যদি সুন্দরী নারী চলে যায় কাছ দিয়ে,
কাব্য পড়ে থাকে, গীত ভালো লাগে না,
সব মন ছোটে ঐ নারীর দিকে।
আবার যখন বুভুক্ষা,
তখন কাব্য, গীত, নারী কিছুই ভালো লাগে না।
অন্নচিন্তা চমৎকারা। (১০৭)

অসারে সংসারে

বিষয়ীর ঈশ্বর কিরূপ জানো?

খুড়ি-জেঠির কোঁদল শুনে,
খেলা করবার সময়ে ছেলেরা যেমন বলে—
'আমার ঈশ্বরের দিব্য।'
যেমন ফিটবাবু—
পান চিবুতে-চিবুতে, স্টিক-হাতে বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে,
একটি ফুল তুলে বন্ধুকে বলে,
আহা, ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন! (১১৯, ৪৪৩, ৫৩৫)

সাধুর কাছে যখন আসে বিষয়ীরা—
তখন লুকিয়ে রাখে বিষয়চিন্তা, বিষয়কথা।
ফিরে গিয়ে বাহির করে সেগুলি।
পায়রা মটর খেলে, মনে হল সব হজম হয়ে গেল,
কিন্তু রেখে দেয় গলার ভিতরে,
গলায় মটর গিড়্‌গিড়্‌ করে। (৭৭৯)

গঙ্গাস্নানে পাপ যায়।
গেলে কি হবে?
লোকে বলে, পাপগুলো থাকে গাছের উপরে।
গঙ্গা নেয়ে মানুষটা যখন ফেরে—
তখন পুরনো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে
এসে পড়ে ঘাড়ের উপর। (২২২, ১২৬)

বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে, দর্শন হবে না তাঁর।
দেশলাইয়ের কাটি ভিজে থাকলে,
হাজার ঘষো, জ্বলে না,
কেবল একরাশ কাটি লোকসান। (৬৫)

সংসারীর অনুরাগ ক্ষণিক,
তপ্ত খোলায় জল থাকে যতক্ষণ।
একটি ফুল দেখে হয়ত সে বললে—
আহা, কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি।
তাতেই শেষ। (৬৩৫, ৬৭৩)

মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!
দান-ধ্যান তো কতই!!
নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার-হাজার টাকা খরচ,

আর পাশের বাড়িতে 'অন্ন নেই,' তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়,
অনেক হিসেব ক'রে দান।
খেতে পাচ্ছে না ? তা কি করা যাবে ? মরুক শালারা!
আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভালো থাকলেই হল।
মুখে বলে সর্বজীবে দয়া !! (৫৩৩-৩৪)

এমন লোক আছে যাদের চৈতন্য হয় না কোনোমতে।
যেমন কুমীর।
তার গায়ে তরবারির চোপ লাগে না।
পাথরে পেরেক পুঁতলে—পেরেকের গোড়া ভেঙে যায়,
পাথরের হয়না কিছুই। (১০৯, ৪৭৭)

মানুষ মনে করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে,
কিন্তু কামিনী কাঞ্চন ভোগে মত্ত।
মাথায় মাণিক আছে,
তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে। (৮৭৯)

ভগবানের সন্ধান পায়নি,
তাই সংসার করে।
পাতকুয়ার ব্যাঙ পৃথিবী দেখেনি,
কেবল জানে পাতকুয়াটি,
তাই বিশ্বাস করবে না, পৃথিবী আছে। (৫৩৫)

সংসারীর প্রতি

তোমরা বলো—'জগতের উপকার।'
জগৎ কি এতটুকু গা !
তুমি কে—জগতের উপকার করবে ?
সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎ করো, লাভ করো তাঁকে।
তিনি শক্তি দিলে তবে করতে পারো সকলের হিত,
নচেৎ নয়। (৪১)

দীঘিতে হাতী নামলে টের পাওয়া যায় না।
ডোবাতে নামলে তোলপাড়।
জল উপচে পড়ে পাড়ের উপর। (৫১২)

সন্তান প্রতিপালন—সাবালক না হওয়া পর্যন্ত।
পাখি বড় হয়ে আপনার ভার নিতে পারলে—
ধাড়ী তাকে ঠোকরায়,
দেয় না কাছে আসতে। (১২৩)

নমস্কার মানসেই ভালো।
কী দরকার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার?
মানস নমস্কারে কুণ্ঠিত হবে না কেউ। (৭৬৮)

যত পরস্পর প্রণয়—তত মঙ্গল, তত আনন্দ।
যাত্রাওয়ালারা যদি গায় একসুরে,
তবে যাত্রাটি ভালো হয়,
যারা শোনে তাদের আহ্লাদ। (৬৯৬)

তোমরা উপবাস ক'রে এসেছ কেন?
খেয়ে আসতে হয়।
মেয়েরা আমার মার এক-একটি রূপ।
তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না।
মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না আমি। (৯৬৩)

আত্মহত্যা মহাপাপ।
তাতে ফিরে-ফিরে আসতে হবে সংসারে,
ভোগ করতে হবে সংসার-যন্ত্রণা। (৫৫)

তোমরা অত 'পাপ পাপ' বলো কেন?
একশোবার 'আমি পাপী, আমি পাপী' বললে—
তাই হয়ে যায়।
এমন বিশ্বাস করা চাই—
তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি?
তিনি আমাদের বাপ-মা।
তাঁকে বলো, পাপ করেছি, আর করব না।
দেহ-মন পবিত্র করো তাঁর নামে,
পবিত্র করো জিহ্বা। (৪৯৭, ৮৮৯)

শক্তি কোনোখানে বেশি প্রকাশ,
কোনোখানে কম।

সূর্যের আলো—
মৃত্তিকার চেয়ে বেশি প্রকাশ জলে,
জলের চেয়ে দর্পণে। (৪৪৩)

কর্মফল আছেই।
কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধার সুন্দরী কাঠ থাকে।
কাঠ প্রথমে বেশ জ্বলে,
ভিতরে জল আছে টের পাওয়া যায় না।
জ্বলা শেষ হলে ফ্যাঁচ্-ফোঁচ্ ক'রে নিবিয়ে দেয় উনুন।
কাম ক্রোধ লোভ—
সাবধান থাকতে হয় এদের থেকে।
হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করেছিল ক্রোধে,
শেষে মনে পড়ল সীতা আছেন অশোকবনে,
তখন ছটফট করতে লাগল—
পাছে সীতার কিছু হয়। (৮৬৭)

পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা ভালো,
কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শোনা, আর কাশীদর্শন-
অনেক তফাত।
শাস্ত্রে লেখা আছে অনেক কথা,
কিন্তু ঈশ্বর-সাক্ষাৎ না হলে সব বৃথা। (১৭৪, ৪৬৯)

দুই পথ—
কর্মযোগ, আর মনোযোগ। (৭৬৮)

গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার—
তাগী—তাগী—তাগী।
ত্যাগী—ত্যাগী—ত্যাগী। (৭৬৯)

দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই।
তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,
ঠাকুরসেবায় লাগবে। (৬৮৩)

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন।
তবে মাখামাখি চলে ভালো লোকের সঙ্গে।
মন্দ লোক থেকে তফাত থাকতে হয়।

বাঘের ভিতরও নারায়ণ,
তাই বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। (২১)

ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন ?
ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হল,
ঠাকুরসেবায় চলে।

ছোকরারা যেন নতুন হাঁড়ি,
পাত্র ভালো, দুধ রাখা যায় নিশ্চিন্তে।
জ্ঞান-উপদেশ দিলে ওদের শীঘ্র চৈতন্য হয়,
বিষয়ী লোকদের হয় না।
দৈ-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়,
পাছে নষ্ট হয়ে যায়। (৮৩৮)

ভাগবতে পাই,
অবধূত গুরু করেছিল এক চিলকে।
মাছ ধরছিল জেলেরা, চিল ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে গেল।
তার পিছনে তাড়া করল হাজার-হাজার কাক,
কা—কা—কা—কা—। বড় গোলমাল।
চিল যেদিকে যায়, সেদিকে কাকের তাড়া,
দক্ষিণে, উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে—পরিত্রাণ নেই।
ব্যতিব্যস্ত সে, একসময়ে পড়ে গেল মুখের মাছ।
কাকগুলো তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল মাছের দিকে।
নিশ্চিন্ত চিল এবার বসল গাছের ডালে, ভাবতে লাগল,
যত গণ্ডগোল ঐ মাছটার জন্য।
অবধূত শিখল,
যতক্ষণ মাছ থাকে ততক্ষণ চিলের পিছুনে কাক।
যতক্ষণ বাসনা, কর্ম, ততক্ষণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি।
শান্তি—বাসনা ত্যাগ হলে। (৮৫)

তাঁকে লাভ করলে সংসার অসার নয়।
যে তাঁকে জেনেছে সে দ্যাখে—তিনিই জীবজগৎ।
তখন ছেলেদের খাওয়াবে—যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ।
পিতামাতাকে সেবা করবে—ঈশ্বর ঈশ্বরী বোধে।
বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে না ঐহিক সম্বন্ধ।
দুজনই ভক্ত ; উভয়ের কেবল ঈশ্বরের কথা,

সর্বভূতে তিনি আছেন জেনে অন্যের সেবা। (৮৯-৯০)

শাস্ত্রের দু'রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ।
মর্মার্থটুকু নিতে হয়।
নিতে হয় সেই অর্থ যা মেলে ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে।
চিঠির কথা, আর চিঠি লিখেছে যে-ব্যক্তি তার মুখের কথা—
অনেক তফাত।
শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা।
মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে—আমি কিছুই লই না। (৫৪২)

কাহিনী-কাব্য

সবই নারায়ণ, কিন্তু—

গুরু শিষ্যকে বললেন—সবই নারায়ণ।
পাগলা হাতী আসছিল।
গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে শিষ্য সরে নাই—
হাতীও নারায়ণ।
মাহুত চেঁচিয়ে বলেছিল—সরে যাও, সরে যাও।
শিষ্য সরে নাই। হাতীও নারায়ণ।
হাতী তাকে আছড়ে চলে গেল।
তবে প্রাণ যায় নাই, মুখে জল দিতে জ্ঞান হয়েছিল।
গুরু বললেন,
তুমি সরলে না কেন?
শিষ্য বললে, আপনি যে বলেছেন—সবই নারায়ণ!
গুরু বললেন—
হাতী নারায়ণ, আবার মাহুতও নারায়ণ।
মাহুত-নারায়ণের বারণ শুনলে না কেন? (২১, ৫৮৫)

সাংসারিক ফোঁস্

রাখালের দল গরু চরাত মাঠে।
মাঠে ছিল এক ভয়ানক বিষাক্ত সাপ,
তার ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত।
এক ব্রহ্মচারী আসছিলেন মাঠের পথে।
রাখালেরা দৌড়ে গেল তাঁর কাছে—
'ঠাকুরমশাই, ওদিকে যাবেন না, যাবেন না, ভয়ানক সাপ।

ব্রহ্মচারী বললেন, ভয় নেই, আমি মন্ত্র জানি।
তিনি এগিয়ে গেলেন, ফণা তুলে ছুটে এল সাপ,
তিনি মন্ত্র পড়লেন,
কেঁচোর মতো সাপ লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে।
ব্রহ্মচারী বললেন, কেন তুই হিংসা করিস ?
আয় তোকে মন্ত্র দেব,
মন্ত্র জপলে ভক্তি হবে ভগবানে, হিংসা থাকবে না।
মন্ত্র জপ ক'রে যাও, আমি আবার আসব।
কিছুদিন যায়।
রাখালরা অবাক হয়ে দ্যাখে, সাপটা কামড়াতে আসে না।
তারা ঢেলা মারে, তবু সাপ রাগে না, একেবারে কেঁচো।
এক রাখাল এগিয়ে গেল সাহস ক'রে,
লেজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে আছড়ে ফেলল মাটিতে,
রক্ত উঠতে লাগল সাপের মুখ দিয়ে, অচেতন।
রাখালরা মনে করল, মরে গেছে সাপটা।
গভীর রাতে চেতনা পেয়ে অতি কষ্টে সে ফিরে গেল গর্তে।
শরীর চূর্ণ, নড়বার শক্তি নেই।
অনেকদিন পরে শরীর কিছু সারলে আহারের চেষ্টায় বেরুত রাত্রে।
এখন অহিংস, খায় ঝরা-পাতা শুধু।
ব্রহ্মচারী এলেন প্রায় এক বৎসর পরে, সন্ধান করলেন সাপটির।
রাখালরা বলল, আপদটা মরেছে।
বিশ্বাস হল না ব্রহ্মচারীর,
যে-মন্ত্র দিয়েছেন তার সিদ্ধি না হলে মৃত্যু হবে না।
খুঁজে খুঁজে তিনি ডাকতে লাগলেন।
গুরুদেবের ডাক শুনে সাপ বেরিয়ে এল গর্ত থেকে,
প্রণাম করল ভক্তিভরে।
গুরু শিউরে উঠলেন তার শরীর দেখে—
এ কি দশা হয়েছে তোর ? এত রোগা কেন ?
সত্ত্বগুণে সাপ ভুলেই গিয়েছিল রাখালদের অত্যাচারের কথা।
বললে, হিংসা করিনা, ফলপাতা খাই, তাই বোধহয় এমন।
গুরু বললেন, না, অন্য কারণ আছে নিশ্চয়,
ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখ—কী হয়েছিল ?
তখন মনে পড়ল।
হাঁ ঠাকুর, ঠিক, রাখালরা একদিন আছড়ে মেরেছিল বটে।
তা ওরা অজ্ঞান, কি ক'রে জানবে, আমি অনিষ্ট করব না ওদের।
গুরু বললেন, আরে ছি, কী নির্বোধ তুই, আত্মরক্ষা করতে পারলি না ?

আমি কামড়াতে বারণ করেছি তোকে,
ফোঁস্ করতে নয়। (২২-২৩)

কে কাকে ছোঁয় ?

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মজ্ঞানী,
কিন্তু প্রথম-প্রথম ভেদবুদ্ধিও ছিল।
চণ্ডাল নিয়ে আসছে মাংসের ভাঁড়,
উনি উঠছেন গঙ্গাস্নান ক'রে,
চণ্ডালের গায়ে লেগে গেল পা।
উনি বলে উঠলেন, তুই আমায় ছুঁলি ?
চণ্ডাল বললে—ঠাকুর তুমিও ছোঁওনি আমাকে.
আমিও ছুঁইনি তোমাকে।
শঙ্করের জ্ঞান হল। (২৫৮)

কার ডোল পরিষ্কার ?

বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে এক সাধুর।
ভিস্তি যাচ্ছিল জল নিয়ে, জল দিতে চাইল সাধুকে।
সাধু বললেন, তোমার ঐ চামড়ার ডোল কি পরিষ্কার ?
ভিস্তি বললে, মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার,
কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র, অনেক ময়লা।
আমার ডোল থেকে জল খাও.
দোষ হবে না। (৯২০)

এক কথায় জ্ঞান

রাজা বললেন—আমায় এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে।
যোগী বললেন —আচ্ছা তাই হবে।
খানিক পরে রাজার কাছে হঠাৎ উপস্থিত এক যাদুকর।
রাজা দেখলেন, দুটো আঙুল সে ঘোরাচ্ছে,
আর বলছে, রাজা এই দ্যাখো! রাজা এই দ্যাখো!
রাজা দেখছেন—দুটো আঙুল।

খানিক পরে অবাক—দুটো আঙুল নয়—একটা।
যাদুকর বলে চলেছে—
রাজা এই দ্যাখো! রাজা এই দ্যাখো! (৯০৩)

মারছেন এবং বাঁচাচ্ছেন

মঠের সাধুরা মাধুকরী ক'রে খায়।
মাধুকরী করতে গিয়ে এক সাধু দেখেন—
জমিদার মারছে একটি লোককে।
সাধু বড় দয়ালু, বারণ করলেন জমিদারকে।
জমিদারের সমস্ত কোপ গিয়ে পড়ল সাধুর উপর,
এমন প্রহার কবলে যে, সাধু অচৈতন্য।
মঠে গিয়ে খবর দিলে কেউ, দৌড়ে এলেন অন্য সাধুরা।
ধরাধরি ক'রে এ'কে নিয়ে গেলেন মঠে।
সাধু তখনো অজ্ঞান, সবাই বিমর্ষ।
কেউ বাতাস করছে, কেউ মুখে দিল একটু দুধ।
সাধুর চৈতন্য হল তাতে, তাকালেন চোখ মেলে।
একজন খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা কবল—
মহারাজ তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে এখন?
সাধু বললেন মৃদুস্বরে—
ভাই, আমাকে মেরেছিলেন যিনি—
এখন দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনিই। (২২৮, ৬৫২)

ঘাস-খাওয়া বাঘ

ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল।
লাফ দিতে গিয়ে প্রসব হয়ে বাঘ গেল মরে।
বাঘের ছানা বাড়তে লাগল ছাগলদের সঙ্গে।
ছাগলেরা ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়!
ছাগলরা ব্যা-ব্যা করে, এও করে।
ক্রমে বড় হল ছানাটা।
একদিন ছাগলের পালে আবার পড়ল বাঘ।
সে বাঘ অবাক—একি, ঘাসখেকো বাঘ!
দৌড়ে গিয়ে ধরলে তাকে, ব্যা-ব্যা করতে লাগল সে

তাকে টেনে নিয়ে গেল জলের কাছে,
বললে, মুখ দ্যাখ জলে—তুই ঠিক আমার মতো।
জোর ক'রে খানিকটা মাংস গুঁজে দিলে মুখে।
সে কোনোমতে খাবে না, এও ছাড়বে না।
তারপর ছানাটা পেল রক্তের স্বাদ।
নতুন বাঘ বলল, বুঝেছিস, তুই আর আমি এক! •
এখন চলে আয় আমার সঙ্গে—বনে। (২৪৯)

সাধু নই—যদি হই!

বাগানে মাছ চুরি করছিল এক জেলে, রাত্রে।
জানতে পেরে গৃহস্থ ঘিরে ফেললে লোকজন নিয়ে।
মশাল নিয়ে চোর খুঁজতে লাগল সকলে।
এদিকে জেলে খানিকটা ছাই মেখে
গাছতলায় বসে আছে, সাধু হয়ে।
ওরা অনেক খুঁজলে—কোথায় চোর?—নেই।
কেবল গাছতলায় ভস্মমাখা সাধু, ধ্যানস্থ।
পরদিন পাড়ায়-পাড়ায় রটে গেল খবর।
লোকজন আসতে লাগল সাধুকে প্রণাম করতে
ফল ফুল মিষ্টান্ন নিয়ে—
পড়তে লাগল টাকা পয়সা।
জেলে ভাবল, কি আশ্চর্য, আমি সত্যকার সাধু নই,
তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি!
সত্যকার সাধু যদি হই—
নিশ্চয় পাব ভগবানকে। (২৪৯)

এখন টাকা নেওয়া বারণ

ত্যাগী সাধু সেজে ছিল এক বহুরূপী।
বাবুরা তাকে টাকা দিতে গেল, এক তোড়া।
উঁহু ক'রে সে চলে গেল,
টাকা ছুঁলেও না।
খানিক পরে, হাত-পা ধুয়ে, নিজের কাপড় পরে এল,
বললে, কি দিচ্ছলে—দাও।
এখন সে চার আনা দিলেও নেবে। (৬৯৯)

কোন্ স্বপ্ন সত্য !

এক কাঠুরে জ্ঞানী, স্বপন দেখছিল।
একজন লোক তার ঘুম ভাঙানোতে বিরক্ত হয়ে বলল,
কেন আমার ঘুম ভাঙালি ?
আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ,
সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম,
কেন তুই ভেঙে দিলি সুখের সংসার ?
সে ব্যক্তি বলল, আরে ও তো স্বপ্ন, ওতে কি আছে ?
কাঠুরে বললে, দূর, তুই বুঝিস না,
আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য,
স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য। (২৮৬)

কাঁদব—কার মৃত্যুতে ?

এক চাষা, ভাবী জ্ঞানী , চাষবাস করে, পরিবার আছে।
অনেকদিন পরে একটি ছেলে হয়েছে, নাম হাবু।
ছেলেটির উপর বাপ-মা দুজনেরই খুব ভালবাসা,
সবেধন নীলমণি।
চাষা মাঠে কাজ করছে, একজন গিয়ে খবর দিলে,
হাবুর কলেরা হয়েছে।
চাষা অনেক চিকিৎসা করালে, কিন্তু মারা গেল ছেলেটি।
বাড়ির সকলে শোকে কাতর, অথচ চাষার যেন কিছু হয়নি।
উল্টে সকলকে বোঝায়, শোক ক'রে কি হবে ?
এই বলে সে চলে গেল চাষ করতে।
মাঠ থেকে ফিরে এলে তার পরিবার বললে,
কি নিষ্ঠুর ! ছেলেটার জন্য একবার কাঁদলে না !
চাষা স্থির হয়ে বললে, কেন কাঁদছি না বলব ?
কাল ভারী একটা স্বপ্ন দেখেছি :
রাজা হয়েছি আমি, আট ছেলের বাপ, খুব সুখ।
তারপর ঘুম ভেঙে গেল।
এখন মহা ভাবনা—
আমার সেই আট ছেলের জন্য শোক করব,
না তোমার এক ছেলে হাবুর জন্য ! (১৪৪-৪৫, ২৫৩)

তিনজনই চোর

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণই চোর।

বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটি লোক,
তিন চোর এসে ধরল তাকে।
এক চোর বললে, এটাকে রেখে কি হবে ?
এই বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে গেল।
অন্য চোর বললে, না হে, কেটে কি হবে,
একে ফেলে রেখে যাও হাত-পা বেঁধে।
তাই ক'রে চলে গেল তারা।
কিছু পরে তাদের একজন ফিরে এল—
আহা, তোমার লেগেছে, এসো বাঁধন খুলে দিই।
বাঁধন খুলে, তাকে সদর রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বলল—
ঐ রাস্তা দিয়ে চলে যাও, তোমার বাড়ি পাবে।
লোকটি বলল, মশাই, অনেক উপকার করলেন,
দয়া ক'রে চলুন আমার বাড়ি পর্যন্ত।
চোর বললে, না ওখানে যাবার জো নেই,
পুলিশে টের পাবে।

তমোগুণ জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে নিয়ে বিনাশ করতে চায়।
রজোগুণে বদ্ধ করে সংসারে।
সত্ত্বগুণ মোচন করে সংসার-বন্ধন, পরমধামের পথে তুলে দেয়,
সেই পর্যন্তই।
কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের থেকে সে অনেক দূরে। (৭১)

কৃপার পশ্চাদ্‌পট

পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়।
শবসাধন করছিল একজন,
অনেক বিভীষিকা দেখল, শেষে তাকে নিয়ে গেল বাঘে।
বাঘের ভয়ে অন্য একজন উঠেছিল গাছে।
নেমে এসে বসে গেল ঐ শবের উপর।
একটু জপ করতে না করতে মা আবির্ভূত।
বললেন, বর নাও।

সে প্রণত হয়ে বললে—
মা, আমি তোমার কাণ্ড দেখে অবাক !
সে ব্যক্তি অত খেটে, আয়োজন ক'রে, তোমার সাধনা করছিল,
তাকে দয়া হল না তোমার,
আর আমি সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন,
আমার উপর এত কৃপা ?
ভগবতী হাসতে লাগলেন :
'বাছা, জন্মান্তরের কথা স্মরণ নেই তোমার।
জন্ম-জন্ম তুমি তপস্যা করেছ।
সেই সাধনবলেই অমন জোটপাট।
তাই দর্শন পেলে আমার।
এখন বলো, কি বর চাও ? (৫৫)

শাঁখ—ভোঁ ভোঁ !

এক গাঁয়ে পদ্মলোচন বলে এক ছোকরা ছিল।
লোকে তাকে ডাকত—পোদো বলে।
গ্রামে ছিল এক পড়ো মন্দির, ভিতরে ঠাকুর-বিগ্রহ নাই,
মন্দিরের গায়ে অশথ গাছ, অন্য গাছপালাও,
ভিতরে চামচিকের বাসা, মেঝেতে ধূলা, চামচিকের বিষ্ঠা।
মন্দিরে যাতায়াত নাই লোকজনের।
একদিন সন্ধ্যার পরে গ্রামের লোক শুনতে পেলে,
মন্দিরের দিক থেকে শাঁখ বাজছে ভোঁ-ভোঁ।
লোকেরা ভাবলে, হয়ত কেউ ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করেছে,
তাই আরতি হচ্ছে সন্ধ্যায়।
ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে দৌড়ে সেখানে উপস্থিত।
তাদের একজন মন্দিরের দরজা খুলে দেখে—
মন্দিরের মার্জনা নাই, চামচিকের বিষ্ঠা,
ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় নাই,
কিন্তু পদ্মলোচন শাঁখ বাজাচ্ছে—ভোঁ-ভোঁ।
লোকটি তখন চেঁচিয়ে বলল—
মন্দিরে তোর নাইকো মাধব ;
চামচিকে এগার জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা,
পোদো, শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল। (২১৪-১৫)

লাগ্ ভেল্কি লাগ্

বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে।
মাঝে মাঝে বলছে, রাজা টাকা দেও, রাজা কাপড়া দেও।
এমন সময়ে উল্টে গেল জিভ তালুর মূলের কাছে,
অমনি কুম্ভক, কথা নাই, শব্দ নাই, নিস্পন্দ।
সেই অবস্থায় তাকে ইঁটের কবরে রাখলে পুঁতে।
হাজার বছর পরে কেউ কবর খুঁড়েছিল।
দ্যাখে, কে একজন সমাধিস্থ।
একটু নাড়াচাড়া দিল, জিভ সরে গেল তালু থেকে।
অমনি চৈতন্য ; আর চীৎকার ক'রে বলতে লাগল—
লাগ্ ভেলকি লাগ্, লাগ্ ভেলকি লাগ্,
রাজা কাপড়া দেও, রাজা টাকা দেও। (২৭৩, ৪৭৫)

মূল্যবোধ

বাবু চাকরকে বললেন, হীরেটা বাজারে নিয়ে যা,
জেনে আয়, কে কি রকম দর দেয় ?
চাকর প্রথমে গেল বেগুনওলার কাছে।
বেগুনওলা নেড়ে-চেড়ে বলল—
এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি।
চাকর বলল—ভাই, আর একটু ওঠো, না-হয় দশ সের দাও !
না। বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি,
এতে পোষায় তো দিয়ে যাও।

চাকর গেল কাপড়ওলার কাছে।
সে বললে, হাঁ, জিনিসটি ভালো, এতে ভালো গয়না হবে,
আমি দিতে পারি ন'শো টাকা।
চাকর বললে, আর একটু ওঠো, না-হয় হাজারই দাও।
না। এক টাকাও বেশি দিতে পারব না,
বাজারদরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি।

চাকর এবার গেল জহুরীর কাছে।
জহুরী একবার দেখেই বলল—
আমি দেবো—একলাখ। (৫৩৬)

ভিক্ষা ? কার কাছে ?

ফকির গিয়েছিল আকবর বাদশার কাছে, ভিক্ষা করতে।
আকবর নমাজ পড়ছিলেন।
আর ধনদৌলত চাচ্ছিলেন—আল্লার কাছে।
শুনে চলে যাচ্ছেন ফকির।
আকবর থামালেন। চলে যাচ্ছ কেন ?
ফকির বললেন—
ভিক্ষা যদি করতে হয়,
ভিখারীর কাছে করব কেন ?
করব মালিকের কাছে। (৪৯১)

প্রথম চাই আত্মশোধন

কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বললেন—
তুমি আর একদিন এসো—
তোমার খাওয়া-দাওয়ার কথা বলে দিব।
রোগীর বাড়ি অনেক দূরে।
অন্যদিন আসতে কবিরাজ বললেন—
তোমার পক্ষে গুড় খাওয়া ভালো নয়।
রোগী চলে যাবার পরে উপস্থিত একজন বললে—
ও-কথাটা তো সেদিন বললেই হত,
ওকে কষ্ট দিয়ে আবার আনা কেন ?
কবিরাজ বললেন, এর মানে আছে।
সেদিন ঘরে ছিল অনেকগুলি গুড়ের নাগ্‌রি।
তাই রোগী বিশ্বাস করত না আমার কথা।
মনে করত, ওঁর ঘরে যেকালে অত গুড়—
তাহলে নিশ্চয় গুড় জিনিসটা খারাপ নয়।
এখন নাগ্‌রি ফেলেছি সরিয়ে,
এখন ওর বিশ্বাস হবে। (৭৭০)

ভূতের পরাজয়

ভূতসিদ্ধ হয়েছিল একজন।
সিদ্ধ হয়ে যেই ডেকেছে অমনি ভূত হাজির

ভূত বললে, কাজ দাও, দিতে না পারলেই ঘাড় ভাঙব।
সে ব্যক্তি একে একে সব কাজ করিয়ে নিলে,
শেষে আর কাজ পায় না।
ভূত বললে, তবে এবার তোমার ঘাড় ভাঙি।
ভূতের কাছে একটু সময় চেয়ে নিয়ে,
সে-ব্যক্তি চলে গেল গুরুর কাছে।
সব শুনে গুরু বললেন—
তুই তাকে এই চুলটা দিয়ে সোজা করতে বল্।
ভূত সে-কাজ করতে লাগল দিন-রাত,
চুল কিন্তু যেমন বাঁকা রইল তেমনি বাঁকা। (৫৬১)

শালার ঘর

পাহাড়ের উপর একজনের কুঁড়েঘর।
অনেক মেহনত ক'রে ঘরখানি করেছিল।
একদিন ভারী ঝড় এল, কুঁড়ে টলমল।
ঘর রক্ষায় চিন্তিত সে, বললে—
হে পবনদেব! ঘরটি ভেঙো না বাবা!
পবনদেব শুনছেন না, ঘর মড়মড়।
লোকটি ফিকির ঠাওরালে।
তার মনে পড়েছে, পবনের ছেলে হনুমান।
সে ব্যস্ত হয়ে বললে—দোহাই বাবা পবন, এ হনুমানের ঘর।
ঘর তবু মড়মড়।
তখন বললে—বাবা, লক্ষ্মণের ঘর, লক্ষ্মণের ঘর।
ঘর মড়মড়।
বললে—বাবা, রামের ঘর, রামের ঘর।
ঘর মড়মড়, পড়ে পড়ে।
প্রাণ বাঁচাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে বললে—
যাঃ, শালার ঘর। (১০৩)

বেয়ানের নাচ

বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অন্য বেয়ান।
সে বেয়ান সুতো কাটছিল—নানা রেশমের।

এ বেয়ানকে দেখে বললে, তুমি এসেছ, আমার খুব আনন্দ,
যাই জলখাবার আনি তোমার জন্য।
সে চলে যাবার পরে রেশমী সুতো দেখে লোভ হল এর,
একছড়া সুতো লুকিয়ে ফেলল বগলে।
সে বেয়ান জলখাবার এনে খাওয়াতে লাগল উৎসাহের সঙ্গে।
কিন্তু সুতোর দিকে চেয়েই বুঝল কি হয়েছে?
সুতো আদায়ের ফন্দী ঠাওরাল।
বলল—বেয়ান, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ,
আজ ভারি আনন্দের দিন, এসো নৃত্য করি দুজনে।
দুই বেয়ানে নাচতে লাগল।
এ বেয়ান দেখলে, ও-বেয়ান নাচছে হাত না তুলে।
বললে, এই আনন্দের দিনে এক হাত তুলে নাচা কি?
এই দ্যাখো, আমি নাচছি দু'হাত তুলে।
চোর বেয়ান বড়ই সেয়ানা।
নাচতে লাগল এক হাত তুলে, বগল টিপে,
হেসে-হেসে বলল—
যে যেমন জানে বেয়ান, যে যেমন জানে! (৪৭৩)

সুখের বিছানা

মেছুনি অতিথি হয়েছিল মালীর বাড়িতে।
তাকে শুতে দেওয়া হল ফুলের ঘরে।
অনেক রাত পর্যন্ত গন্ধে ঘুম হল না তার।
বাড়ির গিন্নী বলল—কিরে, ছটফট করছিস কেন?
সে বললে—কে জানে বাপু, বুঝি ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না।
আমার আঁষ-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো?
আঁষ-চুপড়ি আনাতে, তাতে জলের ছিটে দিয়ে,
নাকের কাছে রেখে সে ঘুমোতে লাগল—
ভোঁস্ ভোঁস্। (৯৬৪-৬৫)

আমি কিন্তু সাঁতার জানি

নৌকা ক'রে গঙ্গা পার হচ্ছিল কয়েকজন
এক পণ্ডিত বড়াই করছিল বিদ্যার—

'আমি নানা শাস্ত্র পড়েছি—বেদ, বেদান্ত, ষড়্দর্শন।'
পণ্ডিত তারপর জিজ্ঞাসা করলেন একজনকে—
বেদান্ত জানো ?
আজ্ঞা না।
সাংখ্য, পাতঞ্জল জানো ?
আজ্ঞা না।
দর্শন-টর্শন কিছুই পড়ো নাই ?
আজ্ঞা না।
এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়, নৌকা ডুবছে।
মূর্খ লোকটি বললে,
পণ্ডিতজী, আপনি সাঁতার জানেন ?
'না'।
মূর্খ বললে,
আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না—
কিন্তু সাঁতার জানি। (৬৮১)

হেলে গরুর পণ্ডিত

একজনের ভাগবতের পণ্ডিত দরকার।
পণ্ডিত রোজ এসে শোনাবে ভাগবত।
তেমন পণ্ডিত পাওয়া যাচ্ছে না।
অনেক খোঁজার পরে খবর দিলে একজন—
হাঁ, একটি ভালো পণ্ডিত পাওয়া গেছে।
তাহলে তাঁকেই আনো।
লোকটি বললে, কিন্তু একটু গোল আছে।
পণ্ডিতের রয়েছে বেশ খানকয় লাঙল আর হেলে গরু,
তাদের নিয়ে সারাদিন থাকতে হয়, অবসর কম।
যার পণ্ডিত দরকার সে বললে—
ওহে, হেলে গরু আর লাঙলওলা পণ্ডিত আমি চাইছি না,
যার অবসর আছে, শোনাতে পারবে হরিকথা,
চাই তাকেই। (৫৯৩)

যমদূত ও বিষ্ণুদূতের বিচার

দু'বন্ধু পথে যাচ্ছে।

ভাগবত পাঠ হচ্ছিল এক জায়গায়।
এক বন্ধু বললে, এসো ভাই, ভাগবত শুনি।
অন্য বন্ধু একটু উঁকি মেরে চলে গেল বেশ্যালয়ে।
খানিক্ষণ পরে সেখানে তাব বিরক্তি ধরল,
সে আপনা-আপনি বলতে লাগল,
ধিক্ আমাকে, বন্ধু আমার হরিকথা শুনছে,
আর আমি পড়ে আছি কোথায়।
ওদিকে যে ভাগবত শুনছে তার মনেও ধিক্কার,
সে ভাবছে, আমি কি বোকা।
এখানে ব্যাড়-ব্যাড ক'রে কি-যে বকছে।
আব ওখানে বন্ধু আমোদ কবছে কত।
এবা দুজনেই মবল।
যে ভাগবত শুনছিল তাকে ধরল যমদূত
আব যে বেশ্যালযে গিছল তাকে নিযে গেল বিষ্ণুদূত। (২৩১)

স্যাকরার অতি ভক্তি

স্যাকবার দোকান।
স্যাকরা পরম বৈষ্ণব, কপালে তিলক, হাতে হরিনামেব মালা।
বিশ্বাস ক'রে সবাই তার দোকানে আসে,
ভাবে, ভক্ত বৈষ্ণব, ঠকাবে না।
খদ্দের এলে কোনো ভিতরেব কাবিগব হযত বলছে—
কেশব! কেশব!
বাইরের কারিগর বলল—গোপাল! গোপাল!
ভিতব থেকে কেউ বলছে—হবি! হবি!
বাইরে থেকে বলল—হর! হব!
দোকানে এত ভগবানের নাম, কাজেই খরিদ্দার মনে কবে
স্যাকরা অতি উত্তম লোক।
ব্যাপারটা কি জানো?
কেশব কেশব মানে—কে সব? এসব কে?
গোপাল গোপাল মানে—এরা গরুর পাল।
হরি হরি-র অর্থ—যদি গরুর পাল হয়—
তাহলে হরণ করি? হরণ করি?
আর, হব হর, অর্থাৎ—হ্যাঁ, হরণ করো! হবণ করো!
কেননা এরা গরুর পাল। (১৯১-৯২)

তেজের আগুনে সংসার-বারি

জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দিরের পূজারীরা,
মহা তেজস্বী, বিয়ে করেনি।
রাজা পাঠালেন ডেকে, এলো না।
বলে পাঠাল, রাজার যদি দরকার থাকে,
তাঁকেই আসতে বলো।
ব্রাহ্মণরা জ্বলছে তেজে দাউ দাউ।
এ তেজের ক্ষয় চাই।
রাজা ও অন্য সকলে মিলে তাদের বিয়ে দিয়ে দিলে।
এখন তারা সুখে ঘর-সংসার করে,
এখন আর তাদের রাজদ্বারে ডাকতে হয় না,
নিজেরাই এসে হাজির।
বলে, মহারাজ, এলুম আশীর্বাদ জানাতে,
নির্মাল্য এনেছি, ধারণ করুন।
মহারাজ ! জয় হোক তোমার ! সংসারের প্রতিপালক তুমি,
আমার ছোট ছেলেটির অন্নপ্রাশন, বড়টির হাতে-খড়ি,
তোমার কল্যাণে শূন্য ভাণ্ড পূর্ণ হবে জানি। (৫৮)

কে কার ?

গুরু বোঝালেন শিষ্যকে—ঈশ্বরই কেবল আপনার, আর কেউ নয়।
শিষ্য বললে—কেন ? মা, পরিবার, এরা এত যত্ন করে, ভালবাসে,
আমাকে না দেখলে চোখে অন্ধকার দ্যাখে।
গুরু বললেন—ও তোমার মনের ভুল, দেখিয়ে দেব এখনি।
নাও, এই ঔষধ-বড়ি দিচ্ছি,
বাড়ি গিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকো, লোকে মনে করবে, তুমি মরে গেছ,
কিন্তু বাহ্যজ্ঞান থাকবে, সব দেখতে শুনতে পাবে।
আমি গিয়ে পড়ব যথাসময়ে।
শিষ্য তাই করল।
তাকে অচৈতন্য দেখে বাড়িতে মহা কান্নাকাটি।
হাজির হলেন গুরু কবিরাজ-বেশে।
বললেন, ঔষধ আছে, এ বেঁচে যাবে।
তবে দেবার আগে ঔষধটি খেতে হবে আর একজনকে,
তার কিন্তু মৃত্যু হবে।

এখানে তো এর মা, পরিবার ইত্যাদি আছেন,
এ'রা অবশ্য কেউ না কেউ খাবেন,
তা হলেই ছেলেটি বেঁচে উঠবে।
শিষ্য সমস্ত শুনছে।
মা কাঁদছেন ধূলোয় গড়াগড়ি দিয়ে।
কবিরাজ তাঁকে ডেকে বললেন,
তোমাকে আব কাঁদতে হবে না, এই ঔষধটি খাও,
তাহলে তুমি মরলেও ছেলে যাবে বেঁচে।
ঔষধ হাতে মা ভাবতে লাগলেন,
অনেক ভাবলেন,
ভেবে-চিন্তে বললেন, কাঁদতে-কাঁদতেই,
বাবা, আমার যে আবও ছেলে-মেয়ে আছে,
আমি গেলে তাদের কি হবে, কে তাদের দেখবে?
তাদেব জন্যই ভাবনা,
আমি কি ক'বে ওষুধটি খাবো?
এবাব ওষুধটি দেওয়া হল পবিবারকে।
সেও কাঁদছিল আকুল হয়ে।
ঔষধ হাতে নিয়ে সে কাঁদতে-কাঁদতেই বলল—
ওগো, ওঁব যা হবার তা হয়েছে গো,
আমাব অপোগণ্ডগুলির কি হবে বলো গো,
আমি চলে গেলে কে ওদের বাঁচাবে গো,
আমি কেমন ক'রে এ-ঔষধ খাই বলো গো!
শিষ্যের ঔষধের নেশা ছুটে গেছে ইতিমধ্যে।
ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, বললে—
হাঁ গুরুদেব, কেউ কারো নয়।
গুরুব সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। (৩৪১-৪২)

সব বুঝে চলে আয়

গুরু শিষ্যকে বললেন, চলে আয়।
শিষ্য বললে, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, যেতে পারছি না ওব জন্য।
হঠযোগ করত শিষ্য। গুরু তাকে ফন্দী শেখালেন।
একদিন দেখা গেল, তার বাড়িতে কান্নাকাটি।
সে বসে আছে আসনে, এঁকে বেঁকে আড়ষ্ট।
সকলে বুঝল, বেরিয়ে গেছে প্রাণবায়ু।

স্ত্রী আছড়ে পড়ে কাঁদছিল—
ওগো আমার কি হল গো,
ওগো তুমি আমার কি ক'রে গেলে গো,
ওগো দিদি, আমার এমন হবে জানতাম না গো।
আত্মীয় বন্ধুরা খাট এনেছে, তাকে বার করতে হবে ঘর থেকে।
কিন্তু সে এ'কে বেঁকে এমন যে, বেরুচ্ছে না।
এক প্রতিবেশী দৌড়ে নিয়ে এল কাটারি।
স্ত্রী অস্থির হয়ে কাঁদছিল, ছুটে এল দুম্‌দুম্‌ শব্দ শুনে—
ওগো তোমরা কি করছ গো?
প্রতিবেশী বলল— ইনি বেরুচ্ছেন না, তাই কাটছি দরজা।
স্ত্রী বললে, ওগো, এমন কর্ম করো না গো,
আমি এখন রাঁড়-বেওয়া, দেখবার কেউ নেই,
নাবালকদের মানুষ করতে হবে,
এ দোর গেলে আর তো হবে না।
ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে,
হাত-পা কেটেই ওঁকে বার করো।
তাই না শুনে হঠযোগী খাড়া দাঁড়িয়ে;
তবে রে শালী, আমার হাত-পা কাটবে?
চললুম।
সে বেরিয়ে পড়ল। (৫৪০)

রামের ইচ্ছা

এক গ্রামে এক তাঁতী থাকে, বড় ধার্মিক,
সকলে তাকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে।
তাঁতী কাপড় বিক্রি করে হাটে।
খরিদ্দার দাম জিজ্ঞেস করলে বলে,
রামের ইচ্ছা, সুতোর দাম একটাকা,
রামের ইচ্ছা, মেহনতের দাম চার আনা,
রামের ইচ্ছা, মুনাফা দু'আনা,
রামের ইচ্ছা, কাপড়ের দাম একটাকা ছয় আনা।
লোকটি ভারী ভক্ত।
খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেকক্ষণ থাকে চণ্ডীমণ্ডপে,
ঈশ্বরচিন্তা করে, নামগুণ-কীর্তন।
একদিন অনেক রাত, লোকটির ঘুম হচ্ছে না, তামাক খাচ্ছে,

এমন সময়ে একদল ডাকাত যাচ্ছিল ডাকাতি করতে,
তাদের মুটের অভাব, তাই টেনে নিয়ে চলল তাঁতীকে।
এক গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি ক'রে জিনিস চাপালো তাঁতীর মাথায়,
তারপর যেই পুলিশ এসে পড়ল অমনি পালাল।
ধরা পড়ল বেচারা তাঁতী, তার মাথায় ডাকাতির মোট।
সে রাত্রি হাজতবাস, পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচার।
গ্রামের লোক জানতে পেরে হাজির।
তারা সমস্বরে বললে, এ লোক ডাকাতি করতে পারে না।
সাহেব জিজ্ঞাসা করলে তাঁতীকে, কী হয়েছিল সঠিক বলো?
তাঁতী বললে, শুনুন হুজুর,
রামের ইচ্ছা, আমি রাত্তিরে ভাত খেলুম,
রামের ইচ্ছা, চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি,
রামের ইচ্ছা, অনেক রাত হল,
রামেব ইচ্ছা, তাঁর নামগান কবছিলুম,
রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে,
রামের ইচ্ছা, তারা টেনে নিয়ে গেল আমাকে,
রামের ইচ্ছা, তারা গৃহস্থের বাড়ি ডাকাতি করল,
রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিল,
রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম,
রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোক হাজতে দিল,
রমের ইচ্ছা, আজ সকালে হুজুরের কাছে এনেছে।
সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন—
তাঁতীকে ছেড়ে দিতে।
তাঁতী রাস্তায় বেরিয়ে বন্ধুদের বললে—
রামের ইচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। (১৩৯-৪০)

শাঁখাপরা হাতখানি

রণজিৎ রায় জমিদার।
তপস্যার জোরে ভগবতীকে পেয়েছিলেন কন্যারূপে।
মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করেন,
সেই গুণে আটকে রেখেছিলেন তাকে।
মেয়ে কাছছাড়া হত না বাপের।

রণজিৎ রায় একদিন বড় ব্যস্ত জমিদারীর কাজে।

মেয়ে কেবলই বলছে—
বাবা, এটা কি, বাবা ওটা কি ?
বাপ মিষ্টি ক'রে বললেন—
মা এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।
মেয়ে কোনোমতে যায় না।
শেষে অন্যমনস্ক বাপ বললেন—
তুই এখান থেকে দূর হ।

মেয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই ছুতায়।
শাঁখারী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে,
শাঁখা পরল তাকে ডেকে,
দাম দেবার কথায় বললে –
অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, নিও।
তারপরে তাকে আর দেখা গেল না।

টাকার জন্য শাঁখারী ডাকাডাকি করছে—
মেয়ে কোথায় গেল ? বাড়িতে নেই ! কোথায় গেল ?
খোঁজ, খোঁজ।
চারদিকে লোক ছুটল সন্ধানে।
শাঁখারীর টাকা পাওয়া গিয়েছিল কুলুঙ্গিতে।
বাপ কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছে,
লোকজন এসে বলল,
দিঘিতে কি যেন দেখা যায়।
বাপ ছুটল দিঘির ধারে।
শাঁখাপরা হাতটি একবার উঠল,
তারপর নেমে গেল—
চিরতরে। (৭৯৬)

ডাকলেই আসব

বালক জটিল,
পাঠশালায় যেত বনের পথ দিয়ে।
ভয় পেত।
মাকে বলাতে তিনি বললেন—
তোর ভয় কি, তুই মধুসূদনকে ডাকবি।

ছেলে বললে, মধুসূদন কে হয় ?
মা বললেন, দাদা হয় ।
তখন একলা পথে জটিল যেই পেয়েছে ভয়,
অমনি ডেকেছে—মধুসূদন দাদা ।
কেউ কোথাও নেই ।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদেছে—
কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো,
আমার ভয় পেয়েছে ।
ঠাকুর থাকতে পারেন নি, এসে বলেছেন—
এই যে আমি, ভয় কি তোমার !
পাঠশালার মুখে তাকে পৌঁছে দিয়ে বলেছেন—
তুমি যখনই ডাকবে তখনি আসব,
ভয় নেই । (২৮১)

দ্বিতীয়ার চাঁদ

সীতা রামকে বলেছিলেন,
রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রাম আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ ।
রাবণ তার মানে বুঝে নাই, ভারী খুশি ।
সীতার বলার উদ্দেশ্য—
রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে,
এবার হ্রাস পাবে ।
আর দিন-দিন বৃদ্ধি পাবে রামচন্দ্র—
দ্বিতীয়ার চাঁদ । (১১৫)

দুই তৃষ্ণা মুখোমুখি

রাম লক্ষ্মণ গেছেন পম্পা সরোবরে ।
লক্ষ্মণ দেখলেন—
একটি কাক ব্যাকুল হয়ে বারবার যাচ্ছে জল খেতে,
কিন্তু খাচ্ছে না ।
এ কি ! কেন ?
রাম বললেন, এ কাক পরম ভক্ত,
অহর্নিশ জপ করছে রামনাম,

তৃষ্ণায় ফাটছে ছাতি,
কিন্তু পারছে না জল খেতে,
পাছে ফাঁক পড়ে যায় জপে। (৪৮৪)

ভাবে বিহ্বল—কিন্তু হাতে ইঁট

বৈকুণ্ঠে বসে আছেন লক্ষ্মী নারায়ণ।
হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন।
লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন, বিস্মিত হয়ে বললেন–
ঠাকুর, কোথা যাও ?
নারায়ণ বললেন, বড় বিপদে পড়েছে ভক্ত,
যাচ্ছি তাকে রক্ষা করতে।
নারায়ণ কিন্তু ফিরে এলেন তখনি।
লক্ষ্মী শুধোলেন—
ঠাকুর, এত শীঘ্র ফিলে এলে যে !
নারায়ণ হাসলেন।
'ভক্তটি প্রেমে বিহ্বল হয়ে চলতে-চলতে
মাড়িয়ে ফেলেছিল ধোপাদের কাপড়,
ধোপারা তেড়ে এসেছিল লাঠি নিয়ে।'
'তাহলে তাকে রক্ষা না ক'রে ফিরে এলে কেন ?'
নারায়ণ আবার হাসলেন।
'দেখলাম. ভক্তটি নিজেই ইঁট তুলেছে।' (৫৬১)

যখন স্বয়ং তিনি মারেন

পম্পা সরোবরে স্নানে গেছেন রাম লক্ষ্মণ,
মাটিতে গুঁজে রাখলেন ধনুক।
স্নানের পরে ধনুক তুলে লক্ষ্মণ দেখেন—রক্তাক্ত।
রাম বললেন, দ্যাখো ভাই দ্যাখো, বুঝি কোনো জীবহত্যা হল।
মাটি খুঁড়ে লক্ষ্মণ দেখেন, একটি বড় ব্যাঙ, মুমূর্ষু।
রাম করুণস্বরে বললেন, কেন তুমি চীৎকার করনি,
তাহলে চেষ্টা করতাম বাঁচাবার ;
তোমাকে যখন সাপে ধরে তখন তো চীৎকার করো।
ব্যাঙ বললে—সাপে যখন ধরে তখন চীৎকার ক'রে বলি,

রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো।
এখন দেখছি রামই মারছেন—
তাই আছি চুপ ক'রে। (৪৮৫)

শরের শক্তি ও শোকের শক্তি

শোক হবে না ?
রাবণবধ হল,
লক্ষ্মণ দৌড়ে গেলেন রাবণের কাছে।
দেখেন, হাড়ের ভিতরও এমন জায়গা নেই
যেখানে নেই ছিদ্র।
লক্ষ্মণ বললেন,
রাম, তোমার বাণের কি মহিমা !
রাম বললেন,
ভাই, যেসব ছিদ্র দেখছ, তা বাণের জন্য নয়।
হাড় জর্জর হয়েছে, একেবারে বিদীর্ণ—
শোকে। (২৩৬)

নিকষার বাঁচার সাধ

দর্শনের পর ভক্তের সাধ হয় তাঁর লীলা দেখি।
রাবণবধের পরে রামচন্দ্র প্রবেশ করলেন রাক্ষসপুরীতে,
বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল।
লক্ষ্মণ বললেন, এ কি !
বুড়ি এত পুত্রশোক পেয়েছে, এখনো প্রাণের ভয় !
নিকষাকে অভয় দিয়ে রামচন্দ্র কাছে আনালেন।
জিজ্ঞাসা করলেন, পালাও কেন ?
নিকষা বললে—রাম, এতদিন বেঁচে আছি,
তাই তোমার এত লীলা দেখলাম।
তাই আরও বাঁচার সাধ—
আরও দেখব কত লীলা। (৫৩)

বিমূঢ় ভীষ্ম

ভীষ্ম কাঁদছেন শরশয্যায় শুয়ে।
পাণ্ডবরা কৃষ্ণকে বললেন, কি আশ্চর্য !

পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ কাঁদছেন মৃত্যু ভেবে !
কৃষ্ণ বললেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো না—
কাঁদছেন কেন ?
ভীষ্ম বললেন, কাঁদছি এই ভেবে—
ভগবানের কার্য বুঝলুম না কিছুই ।
হে কৃষ্ণ, তুমি ফিরছ পাণ্ডবদের সঙ্গে,
রক্ষা করছ পদে-পদে,
তবু এদের বিপদের শেষ নেই ।
না—ভগবানের কার্য কিছুই বুঝলুম না ! (৫৩, ৪৩৬)

মহাকালের দুন্দুভি

কৈলাসে শিব বসে আছেন,
কাছে আছেন নন্দী ।
এমন সময়ে একটা ভারী শব্দ ।
নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর কিসের শব্দ ?
শিব বললেন, রাবণ জন্মাল—তারই শব্দ ।
খানিক পরে আবার ভয়ানক শব্দ ।
এবার কিসের শব্দ ?
শিব হেসে বললেন—
রাবণবধ হল । (৫৫৮)

যখন সত্যই ব্যাকুল

একজনের বাড়িতে ভারী অসুখ—যায় যায় ।
কেউ একজন বললে—
স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে,
সেই জল থাকবে মড়ার খুলিতে,
একটা সাপ তেড়ে যাবে ব্যাঙের দিকে,
ছোবল মারবার সময়ে যেই লাফ দেবে ব্যাঙটা,
অমনি সাপের বিষ পড়বে মড়ার খুলিতে ।
সেই বিষে তৈরী ওষুধ যদি পারো খাওয়াতে—
রোগী যাবে বেঁচে ।
যার বাড়িতে অসুখ সেই লোক বেরুল বাড়ি থেকে-

দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে খুঁজতে লাগল ব্যাকুল হয়ে।
যেতে-যেতে সত্যই দেখতে পেল মড়ার খুলি,
তার পরেই একপশলা বৃষ্টি।
সে বলছে, হে গুরুদেব, মড়ার খুলি পেলুম,
স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টি হল, তার জল পড়েছে খুলিতে,
এখন কৃপা ক'রে বাকি যোগাযোগ ক'রে দাও।
ব্যাকুল হয়ে সে ডাকছে, এমন সময়ে দ্যাখে,
সত্যই বিষধর সাপ আসছে।
তার বুক দুরদুর, ডাকছে—হে গুরুদেব, বাকিটাও দাও।
বলতে-বলতে ব্যাঙ এলো,
সাপ তাড়া করল ব্যাঙকে,
মড়ার খুলির কাছে ছোবল দিতে গেল,
ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ল অপর দিকে,
আর বিষ পড়ল খুলিতে।
লোকটি নাচতে লাগল হাততালি দিয়ে—
আনন্দে। (১৩৭-৩৮)

আজই খাল খঁুড়ব

তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে জানো ?
দেশে অনাবৃষ্টি,
চাষীরা জল আনছে দূর থেকে খানা কেটে।
এক চাষার খুব রোখ্, প্রতিজ্ঞা করল—
যতক্ষণ না খানার সঙ্গে নদী এক হয়—
সে খানা খুঁড়ে যাবে।
এদিকে স্নানের বেলা হল,
গৃহিণী তেল পাঠিয়ে দিলে মেয়ের হাত দিয়ে,
মেয়ে এসে বললে, বাবা, বেলা হয়েছে, নেয়ে ফেলো।
চাষা বললে, তুই এখন যা, আমার কাজ আছে।
বেলা দু'প্রহর, তখনো চাষী কাজ করছে।
স্ত্রী এসে বলল—
এখনো যাও নাই কেন, ভাত জুড়িয়ে গেল,
তোমার সব বাড়াবাড়ি।
চাষা তেড়ে গেল গালাগালি দিয়ে, কোদাল হাতে,
বললে, আক্কেল নেই তোর, বৃষ্টি হয় নাই, চাষবাস কিছু হল না,

ছেলেপুলে খাবে কি ? না খেয়ে মারা যাবি ?
গতিক দেখে পালিয়ে গেল স্ত্রী।
সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে সন্ধ্যার সময়,
খানার সঙ্গে নদীর যোগ করল চাষা।
একবার বসে দেখল—নদীর জল মাঠে আসছে কুলকুল ক'রে।
তার মন এখন শান্ত, আনন্দে পূর্ণ।
বাড়ি ফিরল, স্ত্রীকে ডেকে বলল,
নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।

আর একজন চাষা—সেও জল আনছিল মাঠে।
তার স্ত্রী যখন এসে বললে, ওগো, অনেক বেলা হয়েছে,
এখন চলো, এত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই,
সে তখন উচ্চবাচ্য না ক'রে, কোদাল রেখে বললে—
তা তুই যখন বলছিস্, চল্।
সে চাষার আর মাঠে জল আনা হল না।
এ হল মন্দ বৈরাগ্যের নমুনা। (৫৭-৫৮)

এই দ্যাখ, আমি চললুম

একজন স্নান করতে যাচ্ছে, কাঁধে গামছা।
তার পরিবার বললে, তুমি কোনো কাজের নও।
বয়স বাড়ছে, ত্যাগ করতে পারলে না কিছুই,
আমাকে ছেড়ে থাকতে পারো না একদিনও।
অথচ ও-বাড়ির অমুক কত ত্যাগী!
স্বামী বললে, কেন, সে কী করেছে ?
স্ত্রী বললে, তার ষোলজন মাগ,
একে একে ত্যাগ করছে সকলকে।
স্বামী বললে, এক-এক ক'রে ত্যাগ ?
ত্যাগ কি একটু-একটু ক'রে হয় ?
ওরে খেপী, ও পারবে না ত্যাগ করতে।
স্ত্রী বললে, তবু তোমার চেয়ে ভালো।
স্বামী বললে, খেপী, তুই বুঝিস না কিছুই, ওর কর্ম নয়,
ত্যাগ আমিই করতে পারব,
এই দ্যাখ, আমি চললুম।
বলেই গামছা কাঁধে বেরিয়ে পড়ল। (৫২৭, ৬৮৯)

এগিয়ে পড়ো

কাঠুরে গিছল বনে কাঠ কাটতে।
এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা।
ব্রহ্মচারী বললেন, ওহে, এগিয়ে পড়ো।
কিছুদিন যায়, সে একদিন বসে আছে,
হঠাৎ মনে পড়ে গেল ব্রহ্মচারীর কথা।
মনে-মনে বললে, আজ আমি এগিয়ে যাব।
এগিয়ে দ্যাখে—অসংখ্য চন্দনের গাছ।
আরও কিছুদিন যায়, মনে পড়ে ব্রহ্মচারীর কথা,
আরও এগিয়ে যায়, দ্যাখে—রূপার খনি।
একদিন আরও এগোল—সোনার খনি।
আরও এগোয় অন্যদিন।
এবার হীরা মানিক রাশি-রাশি।
এখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য।
সে-সব লয়ে একেবারে আগুিল হয়ে গেল। (১০১-১০২, ৪২৩)

শুধু ফাতনায় চোখ

একজন মাছ ধরছে একলা, পুকুরের ধারে।
অনেকক্ষণ পরে ফাত্‌না নড়ল, কাত্‌ হতে লাগল,
টান মারবার উদ্যোগ করছে,
এমন সময় এক পথিক জিজ্ঞাসা করল—
মশায়, অমুক বাঁড়ুজ্জের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন ?
কোনো উত্তর নাই।
ছিপে টান মারবার মুহূর্ত।
পথিক বারবার জিজ্ঞাসা করল উচ্চস্বরে।
এর হুঁস নাই, হাত কাঁপছে,
কেবল ফাত্‌নার দিকে দৃষ্টি।
বিরক্ত হয়ে চলে গেল পথিক।
এধারে ফাত্‌না ডুবল, ছিপের টানে মাছ উঠল আড়ায়।
তখন গামছায় মুখ মুছে লোকটি পথিককে ডাকছে—
ওহে শোনো শোনো, কি যেন বল্‌ছিলে ? (৫২০-২১)

শুধু পাখির চোখে চোখ

লক্ষ্যভেদ করতে হবে—পাখির চোখ।
দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করলেন অর্জুনকে—
কি কি দেখতে পাচ্ছ ? রাজাদের দেখছ ?
অর্জুন বললেন—না।
আমাকে দেখতে পাচ্ছ ?
না।
গাছ দেখতে পাচ্ছ ?
না।
গাছের উপর পাখি দেখতে পাচ্ছ ?
না।
তবে কী দেখতে পাচ্ছ ?
শুধু পাখির চোখ। (৬৮১)

একটু হেসে—চুপ !

স্বামী এসেছে একটি মেয়ের।
সমবয়স্কদের সঙ্গে সে বসে আছে বাইরের ঘরে।
সখীদের সঙ্গে মেয়েটি দেখছে জানলা দিয়ে।
সখীরা বরকে চেনে না।
মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে—
ঐটি তোর বর ?
সে একটু হেসে বলছে—না।
অন্য একজনকে দেখিয়ে বলছে—
ঐটি তোর বর ?
না।
আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে—
তবে কি ঐটি ?
মেয়েটি এখনো বলছে—না।
শেষে তার স্বামীকে দেখিয়ে যখন বললে—
আর ঐটি ?
তখন সে হাঁ-ও বললে না, না-ও বললে না,
কেবল ফিক্ ক'রে একটু হেসে চুপ ক'রে রইল। (৪৪৫)